ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্ম নিরপেক্ষতা

আলী আনোয়ার
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্র স ঙ্গ ক থা

ধর্মনিরপেক্ষতা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম। বস্তুতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ পরস্পর নির্ভরশীল ধারণা। একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না, একটি ছাড়া অন্যটি সত্য হয়ে উঠবে না। বরং জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের ভিত্তিই বানচাল হয়ে যাবে।

পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী আমলের ধর্মাশ্রিত রাজনীতির সংস্কার বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রকে এমনভাবে আবিষ্ট করে ছিল যে, সে সংস্কার কাটিয়ে ওঠা সহজ নয় এবং এই কারণে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমাদের অনেকের মনেই প্রচুর অস্পষ্টতা থেকে গেছে। রাষ্ট্রনীতি হিসেবে ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রয়োগ, সামাজিক জীবনে তার প্রকাশ এবং সর্বোপরি ব্যক্তির চিন্তাজগতে তার তাৎপর্য প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে সতর্ক চিন্তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সংসদ সেখানে গত বৎসর ধর্মনির-পেক্ষতার ওপরে আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং ছাত্র শিক্ষক সকলকে এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। তিন দিন ব্যাপী এই আলোচনা সভায় ছাত্রশিক্ষকদের উপস্থিতি ও আলোচনার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি থেকে বোঝা যায় যে, তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। এখন এই আলোচনা সভার বিভিন্নমুখী বক্তব্যকে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তরা আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। গ্রন্থটি সাধারণ বাঙালী পাঠকসমাজকে উপহার দিতে পেরে আমরাও আনন্দিত।

আশা করছি, আমাদের ব্যক্তিগত সংস্কার সমূহকে এরপর এই আলোচনার আলোকে নতুন করে পরীক্ষা করতে আমরা উদ্বুদ্ধ হব। ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণাই যথেষ্ট নয়; এ সম্বন্ধে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিধি ও চারিত্র সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। এ কথা সাধারণ নাগরিক, দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী মহল সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মযহারুল ইসলাম
মহাপরিচালক,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ
প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে
যে সমস্ত মহৎপ্রাণ ব্যক্তি আত্মাহুতি
দিয়েছেন তাঁদের পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশ্যে।

সম্পাদকের ভূমিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে গত বৎসর উনিশে, বিশে ও একুশে আগষ্ট তারিখে শেরে বাংলা ফজলুল হক হল মিলনায়তনে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর তিনদিন ব্যাপী এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে বা কোন কোন প্রাগ্রসর রাজনৈতিক সংগঠনে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি নতুন কিছু নয়; কিন্তু তবু আপামর জনসমষ্টির সকল পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে এরকম ধরে নেয়াটা ভুল হবে। তা ছাড়া জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতো সেক্যুলরিজমের ধারণাও আমরা পাশ্চাত্য থেকে গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে অসংগতি কিছু নেই বরং আছে এক ধরণের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। তবু ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝায় এবং আমাদের দেশে তা কি রূপ নেবে বা নেয়া উচিত এ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনের চেতনাই সাহিত্য সংসদের সদস্যবৃন্দকে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনদিন ধরে প্রায় চারশ ছাত্র ও সুধী-মণ্ডলীর নিয়মিত উপস্থিতি এবং বহুজনের আলোচনায় অংশগ্রহণ এ সভার সময়োপযোগিতা ও যৌক্তিকতাকে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করেছে। এই বিতর্কে আবেগ বা উত্তেজনার বিচ্ছুরণও কম হয়নি। এই আলোচনা সভা দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং প্রত্যেক বক্তাই তাঁর নিজস্ব চিন্তা, সংশয় বা সংস্কার অকপটে ব্যক্ত করেছেন। বিষয়বস্তু ও

প্রাপ্ত আলোচনার গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করে আমরা এই অধিবেশন-ত্রয়ের প্রবন্ধাবলী এবং আলোচনার মূল বক্তব্যসমূহ সংকলিত করে বৃহত্তর পাঠকসমাজের সামনে রাখলাম।

তিনদিনের বিস্তৃত আলোচনা সভার সংক্ষিপ্ত নির্যাস রচনা করা দুরূহ ব্যাপার। পঞ্চাশ জন বক্তা প্রায় এগার ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতায় যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে দুঘন্টার পাঠ্যবিষয়ে দাঁড় করান নানাদিক দিয়েই সন্তুষ্টি উৎপাদন করবে না। অপূর্ণতার এই সম্ভাবনাটুকু মেনে নিয়েই আমরা প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতা থেকে মূল বক্তব্যটুকু অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছি এবং যতদূর সম্ভব বক্তার ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যটুকুও ধরার চেষ্টা করেছি। বক্তাদের বক্তব্য উত্তম পুরুষে রেখে দেয়াটা এই ইচ্ছা দ্বারাই প্রণোদিত। তবু স্থানাভাবে অনেক চমকপ্রদ বক্তব্য ও বাচনভঙ্গীকে একটি রঙরূপহীন, নির্বিশেষ ও সংক্ষিপ্ত আকার দেয়ার অপ্রিয় দায়িত্বটুকুও মেনে নিতে হয়েছে। আশা করি বক্তারা নিজেদের সহনশীলতার গুণে সম্পাদককে ক্ষমা করবেন।

সাহিত্য সংসদ এ আলোচনা সভার উদ্যোক্তা হলেও এই উদ্যোগের প্রথম থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ খান সারওয়ার মুরশিদ সাহেবের উৎসাহ ও সহযোগিতা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এই আলোচনা চক্রের তৃতীয় তথা সমাপ্তি অধিবেশনে তাঁর সভাপতিত্ব করারও কথা ছিল ; কিন্তু গুরুতর অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি ঐ অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করতে না পারলেও তাঁর লিখিত বক্তব্য এ সংকলনের সমাপ্তিমূলক প্রবন্ধ হিসেবে সংযোজন করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সবশেষে যাঁরা এই আলোচনা সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নানাভাবে আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবার এই সুযোগ গ্রহণ করতে চাই। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব অধ্যাপক ও ছাত্রদের যাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমাদের উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করে তোলায় সহায়তা করেছেন। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আলোচনার তিন অধিবেশনের সভাপতিদের কাছে, যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে এক একটি দীর্ঘ অধিবেশনে কখনো উদ্বেগজনক, কখনো ক্লান্তিকর অবস্থার ভেতর সভাপতিত্বের গুরুদায়িত্ব বহন করেন, যার সবটুকু হয়ত তাঁদের কাছে উপভোগ্য হয়নি। শেরে বাংলা হলের প্রাধক্ষ্য ডঃ কাজী আবদুল মান্নান সাহেবকে তাঁর হলের মিলনায়তনটি তিনদিন ব্যবহার করতে দেবার জন্য এবং বাণিজ্য অনুষদের অধিকর্তা ডঃ আসগর আলী তালুকদার সাহেবকে এই সিম্পোসিয়ামের আলোচনা রেকর্ড করতে তাঁর টেপরেকর্ডারটি ধার দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। বাঙলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ মযহারুল ইসলাম সাহেব আমাদের আর্থিক সংকটের সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য গ্রহণ না করলে হয়ত আরো দীর্ঘকাল গ্রন্থটি দিনের আলোর মুখ দেখতে পেত না, এ জন্য তাঁর কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। এই গ্রন্থের মুদ্রণ প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করেন অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ ও অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক। তার জন্য এঁদের দুজনের কাছে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ সংকলনের দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখিকা মিসেস জোন হোসেন তাঁর বক্তব্য তাঁর মাতৃভাষা ইংরেজীতে রেখেছেন। আমরা গ্রন্থাংশে তার বাংলা অনুবাদ দিয়েছি। মূল প্রবন্ধ পরিশিষ্ট হিসেবে সংযোজিত হল।

আলোচনার তৃতীয় দিনের শেষাংশে টেপ রেকর্ডারটি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সাময়িকভাবে খারাপ হয়ে যাওয়ায় দু'তিনজনের বক্তব্য-বাদ পড়ে গেছে। আমরা এর জন্য বক্তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

গ্রন্থটি প্রকাশে নানা কারণে এক বছরের ওপর সময় লাগল তার জন্য আমরা লজ্জিত ও দুঃখিত। তবে গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিকতা নষ্ট হয়নি এই যা ভরসা।

১, অক্টোবর '৭৩
সাহিত্য সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাস, রাজশাহী

আলী আনোয়ার

সূচীপত্র

প্রথম অধিবেশন

বিষয় : ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা ইত্যাদি

সভাপতি : প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

প্রবন্ধ পাঠ : অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা

ও অধ্যাপিকা কাজী জোন হোসেন

আলোচনা : ডক্টর মফিজ উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ, জালাল উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, লুৎফুল আনিস, অধ্যাপক শাহ্‌ হাবীবুর রহমান, আশরাফ আলী বুলু, ডক্টর এ্যনে গোলাম সামাদ, ডক্টর আসগর আলী তালুকদার, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক দিলীপ নাথ, মোস্তফা কামাল, নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক কাজী হাসিবুল হোসেন ও আরো অনেকে

ধ র্ম নি র পে ক্ষ তা

অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা
অর্থনীতি বিভাগ

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে সংগত কিনা এ প্রশ্ন আমাকে বিব্রত করে। ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রথাবদ্ধ ধর্মেই আমার কোন আস্থা নেই, এবং প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর আমার কাছে একটা ভ্রান্তি অথবা অবান্তর উপদ্রব বলে মনে হয়। এ অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের একপেশে হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আমি অস্বীকার করিনে। তবে এ বিষয়ে আমি সচেতন যে, আমার অস্তিত্ব উপেক্ষা করেই চারপাশের জনসমষ্টি আপন প্রবণতায় চলে, অথবা আপন ইচ্ছায় বসে থাকে। যদিও জনগণের ধর্ম বিমোচন এক কল্যাণ-কর অবস্থা বলে মানি, তবু বাস্তবে তার ব্যাপক সংগঠনে বিশ্বাসী হওয়া যে ক্যানিউটের সমুদ্র-শাসনে প্রয়াসী হওয়ার মতই নির্বোধ ও হাস্যকর তা আমার পছন্দসই না হলেও আমি স্বীকার না করে পারিনে। আর ধর্মনিরপেক্ষতা যতটা বিষয়ীনির্ভর, তার চেয়ে অনেক বেশী বিষয়-নির্ভর বলেই আমি মনে করি।

কিন্তু বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যে কি বোঝায়, এ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে অনেক। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে এক একটা মানে খাড়া করি এবং তাতেই ইচ্ছা হলে বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করি। একজনের ধারণা অন্যজনের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। তবু যেহেতু বিষয়টি বিস্ফোরক এবং সমস্যাকে পাশ কাটানোর পথ প্রশস্ত ও

সুবিধাজনক, তাই এ নিয়ে বিতর্কের ভিতরে না গিয়ে নানা রকম গোঁজা-মিলের জগাখিচুড়িকে মেনে নেওয়াই আমরা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি—ধর্মনিরপেক্ষতার অপব্যাখ্যা যদি আসর জাঁকিয়ে বসে, তবুও। সাচ্চা বুটা, সব রকম ধারণায় নিরপেক্ষ থাকা বোধহয় ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষণ নয়। কিন্তু এ কথা মানলেই আবার এক বিপজ্জনক অবস্থায় আমাদের পিছলে পড়ার সম্ভাবনা। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বিপরীত ধারণার সহাবস্থান অযৌক্তিক হলে ধর্ম সম্পর্কে বিপরীত ধারণার সহাবস্থান যুক্তিসংগত হয় কি? দ্বিতীয়টিকে মানলে প্রথমটির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অধিকার আমাদের বিনষ্ট হয়। এবং তা হলে ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক মানে খোঁজা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তবু যেহেতু ধরে নিই, চিন্তায় নৈরাজ্য ও কর্মে বিশৃঙ্খলা সামগ্রিকভাবে গণজীবনে ক্ষতিকর, তাই ধর্মনিরপেক্ষতার একটা সংগত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা অন্বেষণ একেবারে অর্থহীন মনে হয় না।

এখানে অবশ্য একটা কথা বলা প্রয়োজন, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি যে শুধু আমাদেরই তা নয়। ভারত গত পঁচিশ বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি বলে ঘোষণা করে আসছে। অথচ সেখানেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে এ বিষয়ে ধারণা অস্বচ্ছই রয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়াই সংগত মনে করতেন, জাতীয় জীবনেও প্রথাবদ্ধ সব ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকাই তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতো। অথচ সে দেশেই দার্শনিক রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ ঘোষণা করেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এবং Hindu view of life এর কল্পিত ভাববাদী পূর্ণতায় তিনি আস্থাবান। সে দেশের সংবিধান ঈশ্বরবর্জিত; কিন্তু সংবিধানের রক্ষকদের অনেকেই জাতীয় পরিষদে শপথ নেন ঈশ্বরেরই নামে। পাশ্চাত্যের অনেক 'আলোকপ্রাপ্ত' দেশের রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধেও কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি

নিষ্ঠাবান থাকা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। ইংল্যাণ্ডের অধিপতি গীর্জারও রক্ষাকর্তা, এবং প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় বহির্ভূত কাউকে তাঁর বিয়ে করার অধিকার রাজকীয় অনুশাসনে নিষিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইবেল হাতে শপথ করে রাষ্ট্রীয় কার্যভার গ্রহণ করেন, এবং জার্মানিতে অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নাম ক্রিশ্চান ডিমোক্রাটিক পার্টি।

এ সব দেখে শুনে আমাদের বিভ্রান্তি বাড়ে বই কমে না, প্রশ্ন ওঠে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কি তবে অন্যত্রও উপেক্ষিত? না কি ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এমন কিছু বোঝায়, যাতে রাষ্ট্রীয় বিধানে বিশেষ ধর্মের প্রতি অথবা সাধারণভাবে ধর্ম বা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য কোন আপত্তিকর বিষয় বলে বিবেচিত হয় না।

এ কথা হয়ত আমরা ভুলে যাই যে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' একটা তৈরী করা প্রতিশব্দ। উক্তি ও উপলব্ধির গরমিলের সম্ভাবনা তাই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। য়োরোপে সেক্যুলারিজম হঠাৎ একদিন দিনক্ষণ বেঁধে চালু করা হয়নি। জীবনের প্রয়োজনে তা ক্রমশঃ জীবনকে অঙ্গীকার করার প্রয়াস পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাই মানুষ সচেতন ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা না করেও ঐতিহ্য লালিত হয়ে ও অভ্যাসবশে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে পড়েন। যদিও এটাকে য়োরোপীয় জীবনের সার্বিক সত্য বলে ধরে নেওয়া ভুল হবে, তবুও সেখানে যে বাস্তব অবস্থা সমাজে সেক্যুলারিজম্-এর প্রকাশ স্বাভাবিক ও অনিবার্য করেছে, তার প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়াতেই হয়ত তার অর্থ ধীরে ধীরে একটা স্পষ্টতর রূপ লাভ করে চলেছে। ধ্রুবক হিসেবে শব্দটির ব্যবহার তাই, মনে হয়, অসমীচীন ও বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে।

য়োরোপে মানুষের ধারণায় ও ক্রিয়াকলাপে সেক্যুলারিজম্ নিশ্চিত-ভাবে রূপ পেতে থাকে রেনেসাঁর সময় থেকে। প্রকৃত পক্ষে তখন

থেকেই য়োরোপে আধুনিকতার সূত্রপাত। ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে কিছু মানুষ, মানুষ হিসেবে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে-উঠতে শুরু করেন। যদিও গীর্জাতন্ত্র ও স্কলাস্টিক ধ্যানধারণা একেবারে উঠে যায় না, তবু সেই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মানবমুখী মনোভাব সেখানে আর ঠেকিয়ে রাখা সহজ হয় না। পেত্রার্ক ভাল্লা, দ্য ভিঞ্চি, শেক্সপীয়র এঁদের সবার চিন্তা ও কীর্তি সমকালীন খৃষ্ট ধর্মের নিরানন্দ জগতের ভিত্তিভূমিতে আঘাত হানে। দার্শনিক ব্রুনো ধর্মের পাণ্ডাদের হাতে বন্দী ও পরে নিহত হন; কিন্তু তাঁর বাস্তববাদী দর্শন ধর্মীয় সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে নোতুন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করে। কোন পারলৌকিক প্রত্যাশা নয়, জাগতিক সুখ-দুঃখের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাই নব যুগের চিন্তানায়কদের বেশী করে আকর্ষণ করে, তাঁদের চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটা বিষয় লক্ষণীয় এই রেনেসাঁর মানব-মুক্তি প্রয়াস তৎকালীন গীর্জা-কেন্দ্রিক ধর্মের গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করেই পরিচালিত হয়। সেক্যুলারিজম বলতে এখানে তাই সব ধর্মের সহাবস্থান বোঝায় না। সে ধরনের সমস্যাকে সামনে রেখে রেনেসাঁর উদ্ভব ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদির দম-বন্ধ-করা পরিবেশ থেকে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে মুক্তি দিয়ে জাগতিক সকল বিষয়ে তাকে উৎসাহিত করাতেই সেক্যুলারিজ্‌ম্‌-এর প্রকাশ নিশ্চিত হতে থাকে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ধর্মীয় অনুশাসনে নয়, আপন আপন ঐশ্বর্যের বলেই তখন থেকে য়োরোপে দাঁড়াবার সুযোগ পায়।

অবশ্য এই রেনেসাঁ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনার পথে সামন্তবাদ ও গীর্জার প্রভুত্ব

বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ধর্মের সামাজিক চাহিদা পূরণের ক্ষমতা ভিতরে ভিতরে লুপ্ত হতে থাকে ; —যদিও সব মানুষ সে সময়ে এ বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন থাকে না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কাছে ধর্মকে প্রকৃত পক্ষে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করে তার বাইরের খোলসে যদিও ঠাট বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় আরো কিছুকাল।

তবে একথা অস্বীকার করা চলে না যে, রেনেসাঁ সব মানুষের, এমন কি অধিক সংখ্যক মানুষেরও, আন্দোলন ছিলো না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবন জটিল ও বহুমাত্রিক। একই সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে তাদের অবস্থান সম্ভব। য়োরোপে রেনেসাঁ পর্বেও এই রকম চিন্তায় ও কর্মে নানা স্তর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তীব্র অন্তর্বিরোধ বর্তমান ছিলো। ধর্মের পাণ্ডাদের উৎপীড়ন থেকে রেহাই পাননি ব্রুনো অথবা গ্যালিলিও। এবং এই উৎপীড়নে সামগ্রিকভাবে সমাজের সমর্থন মোটেই অকিঞ্চিৎকর ছিল না। যে বতিচেল্লি রঙে রেখায় ধর্মবিমুক্ত শুদ্ধ সুন্দরের উপাসনা করেন, তিনিই পরিণতিতে ধর্মান্ধ সাভোনারোলার প্রবল চরিত্রের পদপ্রান্তে আপনাকে সমর্পণ করে নিশ্চিত হন। তবে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হলো, কালের যাত্রার ধ্বনি অল্প সংখ্যক কিছু মানুষের কানে এক সময়ে বাজে, এবং আপন আপন সুবিশাল কীর্তি দিয়ে সেই যাত্রায় তাঁরা প্রচণ্ড বেগ আনেন। কালের যাত্রায় যা জ্বালানির কাজ করে, তা সমাজবহির্ভূত কোন অলৌকিক শক্তি নয়, তা স্বয়ম্ভুও নয়। আজকের য়োরোপ তার কাজে ও ভাবনায় সে সময়ের সব প্রবণতাকেই স্বীকার করে, যদিও সেক্যুলার ভাবনার প্রয়োগই ব্যক্তি ও সমাজজীবনে অনেক বেশী ব্যাপক।

একটা কথা এখানে বোধহয় অপ্রাসংগিক হবে না যে, প্রাক-রেনেসাঁ যুগে যে অঞ্চল সেক্যুলার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিলো, তা য়োরোপ

নয়, আরব ভূখণ্ড। ইব্‌নে রুশদ্, ইবনে সিনা, ইব্‌নে খালদুন প্রমুখ মনীষীর মুক্ত চিন্তা, সে যুগেও গোঁড়া মোল্লাদের মনঃপূত হয়নি। বস্তুবাদে আস্থা স্থাপন বা গোষ্ঠী চেতনায় ইতিহাসের পথ অন্বেষণ অবশ্যই ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থী। পরবর্তীকালে য়োরোপীয় রেনেস াঁর কোন কোন স্মরণীয় ব্যক্তির মত ওই আরব মনীষীদের অনেককে দুঃখ বরণ করতে হয়েছে। তবু এটা লক্ষণীয় যে, মুক্ত চিন্তার একটা পরিবেশ মুসলিম ও অমুসলিম মনীষীদের চিন্তার বিনিময় ও তার সমৃদ্ধি সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলছিলো। ধ্যাপক অর্থে মানবিক মূল্যবোধে আস্থা, সহনশীলতা ও জ্ঞানচর্চা সমাজের উন্নততর অংশে স্বীকৃত ও শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছিলো। কিন্তু সব পণ্ড করে দিলো ক্রুসেড। শত শত বৎসরের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মযুদ্ধ মুসলমানদের মুক্ত মানসিকতা প্রসারের আর সুযোগ দেয় না. জেহাদের তিক্ততা ও যুদ্ধের উন্মাদনা তাদের ক্রমশঃ আত্মকেন্দ্রিক করে তুলতে থাকে। নোতুন চিন্তার অবকাশ অথবা নোতুন করে সত্যান্বেষণের ইচ্ছা তাদের ধীরে ধীরে ক্ষয় পায়। ক্রুসেডের অবসানে তাই তারা হয়ে পড়ে জীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য। তাদেরই জ্ঞানকে আহরণ করে রেনেস াঁর নায়করা যখন নতুন সম্ভাবনার পথে পা বাড়ান তখন আরব জগৎ ধর্মান্ধতার খোলস পরে অপরিসীম অহংকারে কূপমণ্ডুকতাকে আত্মরক্ষার পরম পথ বলে বেছে নেয়। ইতিহাসে 'যদি'র কোন স্থান নেই জানি, তবু ক্ষোভের সঙ্গে একটা কথা না ভেবে পারিনে, ক্রুসেডের সর্বনাশা দহন যদি ওভাবে না পোড়াতো, তবে রেনেস াঁ ও আনুষঙ্গিক সেক্যুলার চিন্তার প্রথম ফসল হয়ত ঘরে উঠতো আরব জগতেই, এবং তা ঘটতো য়োরোপীয় রেনেস াঁর কয়েকশ বছর আগেই।

যাই হোক, য়োরোপে ধর্মের খুঁটি থেকে মুক্তিতে যে আধুনিকতার শুরু, তা সামন্ততন্ত্রকে পঙ্গু করে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধনতন্ত্র ও শিল্প বিপ্লবের পথে পরিশেষে সমাজবাদের দিকে ধাবিত হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের

সঙ্গে তাল রাখতে ধর্মকেও পরিবর্তন মেনে নিতে হয়। মার্টিন লুথারের সংস্কার ও প্রোটেষ্টান্ট মতবাদের অভ্যুদয় গীর্জার আধিপত্য ও পাণ্ডা-পুরুতদের দৌরাত্ম্য বিশেষভাবে খর্ব করে। দলীয় চেতনার ধারক হিসেবে ধর্ম ক্রমেই গুরুত্ব হারাতে থাকে এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সামাজিক স্থিতিবিধানে এখনও প্রয়োজনীয় মনে হলেও উন্নয়নের নিয়ামক হিসেবে তাদের কেউ আর চিহ্নিত করে না। অবশ্য এ থেকে এমন ধারণা করা অনুচিত যে মানুষ সেখানে ধর্মের আশ্রয়কে পুরোপুরি পরিত্যাগ করার জন্যে মনের দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও নিরীশ্বরবাদী হলবাক, যিনি ঘোষণা করেন, অজ্ঞানতা, ভয় ও প্রবঞ্চনা থেকে ধর্মের উদ্ভব, তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই The System of Nature বিচলিত সংস্কারবোধ ও অন্ধ আবেগতাড়িত জনসাধারণের যুক্তিহীন আক্রোশে খোলা রাস্তায় পোড়ানো হয়। সংস্কার ও প্রতিক্রিয়ার এই ধারা সমাজদেহে এখনও একবারে হীনবল নয়। তবে যা স্মর্তব্য, তা হলো আজকের মানুষের উন্নয়ন স্পৃহা এই সংস্কার ও প্রতিক্রিয়ায় ব্যাহত হয়, স্বকালে লাঞ্ছিত সক্রেটিস, গ্যালিলিও অথবা হলবাকের মত মনীষীদের কীর্তিই আধুনিক মানুষের চিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করে।

সেক্যুলারিজম বহু শতাব্দী ধরে যেভাবে আচরিত ও রূপান্তরিত হয়ে আসছে, আজ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে যদি তারই ঠিক বঙ্গানুবাদ বলে ধরে নিই, তবে শুধুমাত্র সব ধর্মের সহাবস্থানেই তার অর্থ পুরোপুরি ধরা পড়ে না। এ কথা সত্য যে ধর্মনিরপেক্ষতায়' তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতা পূর্ণতা পায়।

যে দেশে একাধিক ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করে, সেখানে রাষ্ট্রীয় বিধানে সর্বধর্মের সহাবস্থান মেনে নেওয়ায় হয়ত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা মেলে, কিন্তু তাতেই দেশের সব মানুষ চিন্তায় ও কর্মে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে না।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহ যদি গণ্ডি ছাড়াবার প্রেরণা না জোগায়, তবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের আপন আপন বৃত্তে একসঙ্গে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা সম্ভব ও স্বাভাবিক। বুদ্ধির মুক্তি তাতে ঘটেনা, এবং সাম্প্রদায়িকতার বিস্ফোরণ যে কোন সময়ে সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বীকৃতি আছে সত্য ; কিন্তু তা থেকে এটা বলা চলে না যে সাম্প্রদায়িকতা সে দেশে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। ধর্মের গণ্ডি ভাঙার প্রবণতা এখনও সে দেশে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেনি, এবং তা না হলে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা দূরের জিনিসই রয়ে যাবে।

তবে প্রথাবদ্ধ, ধর্মশাসিত, গোষ্ঠি জীবনের সংস্কার যেখানে প্রবল, সেখানে সমাজকে উন্নত পর্যায়ে টেনে তোলায় ব্যক্তির দায়িত্ব কতটুকু ? তার করণীয়ই বা কি ? একক প্রচেষ্টায় ব্যক্তি সমাজকে কোন বিশেষ দিকে চালিত করতে পারে, এ ধারণা ভ্রান্ত। প্রগতিমুখী শক্তিগুলো যদি সমাজের ভেতর গড়ে না ওঠে, এবং সমাজের মানুষ যদি সেই শক্তির প্রকাশকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত থাকে, তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির আন্তরিক প্রয়াসও গণজীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্নই থাকে। আবার উল্টো দিকে এ কথাও সত্য যে, যে কোন প্রগতি আন্দোলনই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির পৃথক পৃথক, কিন্তু একাভিমুখী, অথবা সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে রূপ পায়। আসল কথা হলো, সমাজের অভ্যন্তরে প্রগতির শক্তি ও লক্ষণ গুলোকে ঠিক ভাবে চেনা ও তাদের সঠিক প্রকাশে সহায়তা করা। তাৎক্ষণিক ফল না মিললেও পরিণতিতে তা সমাজকেএগিয়ে নিয়ে যায়। য়োরোপে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। রেনেসাঁ পরবর্তী অনেক প্রগতি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই। পথিকৃৎদের যে প্রায়ই দুর্ভোগ সইতে হয় মানবজীবনের ধারায় একথার সত্যতা বারে বারে মেলে। সমাজে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যদি প্রবল হয় এবং প্রথাবদ্ধ ধর্ম যদি তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকলেও অন্তত

কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ধর্মকে উপেক্ষা করার সৎসাহস থাকা চাই। সমাজে উন্নয়নের প্রয়োজন স্বীকৃত হলে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি সাধারণ মানুষের আক্রোশ দীর্ঘকাল স্থায়ী না হবারই সম্ভাবনা। সমাজ ব্যক্তিকে মূল্যবান মনে করতে পারে তখনই যখন প্রবহমান মানব ধারাকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে ব্যক্তিও যত্নবান হয়।

পরিশেষে একটি কথা বলে আমার বক্তব্যে সমাপ্তি টানি। প্রথাবদ্ধ কোন ধর্মেই আমার কোন আস্থা না থাকলেও আমার আপনজন যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারে। তার প্রতি আমার অনুরাগে তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

সেক্যুলরিজ্‌ম্‌

অধ্যাপিকা কাজী জোন হোসেন
ইংরেজী বিভাগ

ইংরেজীতে বক্তৃতা করার জন্য আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন কারণ আমার বাংলা এসমস্ত বিষয়ের ওপর আলোচনা করার পক্ষে যথেষ্ট পরিশীলিত নয়।

মিষ্টার সাহা ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে তার অবস্থান নির্দেশ করে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আমার পক্ষেও সেভাবে শুরু করাই ভাল বলে মনে হয়। ঈশ্বর বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারে আমি মুক্তপন্থী বা নাস্তিক বলে নিজেকে চিহ্নিত করব না। আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন এবং কবুল করা ভাল যে ধর্মের প্রতি আমার একটা আবেগগত দুর্বলতা আছে, শুধু মাত্র নিজের ধর্মের প্রতিই নয়, সাধারণভাবে সব ধর্মের প্রতিই আমার এই পক্ষপাতিত্ব। এবং আমার মনে হয় যে, যদিও প্রায়ই ধর্মকে অপব্যবহার করা হয়েছে—মানুষের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলি বের করে আনার ব্যাপারে কিন্তু তবু উন্নততর ধর্ম বিশ্বাসগুলি সমাজে মঙ্গলময় শক্তি হিসাবেও কম কাজ করেনি যদিও প্রত্যক্ষভাবে হয়ত এই মঙ্গলময়তা রাষ্ট্রীয় শরীরে যুক্ত হয়নি। উন্নততর ধর্মাবলী বলতে আমি অবশ্য সেই সমস্ত ধর্মবিশ্বাসই বোঝাচ্ছি, যে সমস্ত ধর্মের নৈতিক দিক তার ঐন্দ্রজালিক দিকটির চেয়ে প্রাধান্য না পেলেও, অন্ততঃ সামাজিক গুরুত্ব পেয়েছে। আমি বলব যে, আজকের পাশ্চাত্যের জনকল্যাণমুখী

রাষ্ট্রগুলি অনেকখানি খৃষ্টান ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য বা মূল সুরটি গ্রহণ করেছে, যদিও অনেকে এই কথাটি সব সময় স্বীকার করতে চান না। অন্য দিকে প্রখ্যাত সমাজ-সংস্কারকদের অনেকেই খৃষ্টান হিসেবে প্রবল বিশ্বাসে বলীয়ান ও সৎ বলে নিজেদের মনে করেছেন যদিও বাইবেলের নির্দেশ 'অন্যের নিকট যেরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর তার প্রতি সেইরূপ আচরণ কর' বা 'প্রতিবেশীকে আত্মজ্ঞানে ভালবাসো' প্রভৃতি সুভাষিতাবলী অন্ততঃ তাদের নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত হয়নি। আমার মনে হয় মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজন আছে।

সেক্যুলরিজমের প্রশ্নটি আলোচনা করতে হলে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কটি বিবেচনা করে দেখতে হয়। এটা সাধারণ ভাবে সকলেই স্বীকার করবেন যে-সর্বজনের জন্য সুন্দর জীবনযাত্রা সম্ভব করে তোলার জন্যই রাষ্ট্রের অধিষ্ঠান। এই সুন্দর যীবন অবশ্যই একজন লোকের মানসিক জগৎ বা আন্তর প্রবণতাকে ধরে নিয়েই। এই আন্তর প্রবণতাই ধর্মের ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিক দিকের মধ্যে মূর্ত হয়। রাষ্ট্রের তা হলে ধর্মের সঙ্গে কি সম্পর্ক হবে? অনেকগুলো পথই খোলা আছে।

রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক হতে পারে যেখানে আইন মাত্রেই বিধিদত্ত নির্দেশ। ধর্ম-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলি যে ভিত্তির ওপরে তাদের আইন ব্যবস্থা সংস্থাপন করে এসেছেন তার পেছনে আছে ঐশ্বরিক ন্যায় ও বিধানে আস্থা এবং তাদের ধর্মগ্রন্থাদিতে যে অনুশাসনগুলি আছে তাকেই তারা মানুষের মাধ্যমে প্রেরিত ঐশীবাণী বা অভিপ্রায় হিসেবে ধরে নেন। মধ্যযুগীয় ক্যাথলিসিজম-শাসিত রাষ্ট্রে এর উদাহরণ পাই। সমাজের সমস্ত লোকই যখন একই ধর্মাবলম্বী তখন এই জাতীয় ধর্ম-রাজ্য গ্রহণযোগ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু এমনটি প্রায় হয় না বললেই চলে। এমন কি মধ্যযুগের ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে, এর প্রায়

সবকটিতেই আছে সংখ্যালঘু ইহুদী সম্প্রদায়ের উপস্থিতি। যে অত্যাচার এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর করা হয়েছে, যে নির্যাতন এদেরকে সহ্য করতে হয়েছে তা ইউরোপের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই নিগ্রহ চলেছে কয়েক শতাব্দী ধরে। আধুনিক কালেও এই জাতীয় অবস্থার ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক উনবিংশ শতকের সাউদী আরবের কথা। উনবিংশ শতকের সাউদী আরব আজকের মত ঐক্যবদ্ধ একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি কিন্তু ধর্মীয় উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতার চূড়ান্ত প্রকাশ আমরা সেখানে দেখেছি। ইংরেজ পর্যটক ডাউটির ভ্রমণ বৃত্তান্তে তৎকালীন সাউদী আরবের অবস্থার ও তাঁর অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে কৌতূহলী ব্যক্তি মাত্রই প্রণিধান করতে পারেন। ডাউটি নিজের প্রাণটি রক্ষা করে কোনমতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে গেছেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র মুক্ত চিন্তাকে উৎসাহিত ত করেই না বরং প্রতিরুদ্ধ করে এমনকি অবাধ মেলামেশাকেও নিরুৎসাহিত করে এবং এরই সঙ্গে চাপিয়ে দেয় কড়া সেন্সরশিপের পাহারা। বলা হয়ে থাকে যে, এ সমস্ত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এঁরা এঁদের নাগরিকদের অসদাচরণ থেকে রক্ষা করে থাকেন। আসলে কিন্তু এঁরা একজাতীয় স্থিত স্বার্থকেও রক্ষা করেন এর দ্বারা। নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ থিয়োক্রাসী বা ধর্মরাষ্ট্র অত্যন্ত দুর্লভ। বরং বলা যায় যে কোন কোন রাষ্ট্র বিধিতে ধর্মীয় উপাদান অনুষঙ্গ অত্যন্ত প্রবল। এ সমস্ত রাষ্ট্রে যদি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় থাকে তবে সাধারণতঃ অন্ততঃ সংবিধানের কাগজে এদের স্বার্থ সংরক্ষণমূলক নানা বিধান স্থান পেয়ে থাকে কিন্তু যেহেতু ধর্মই হচ্ছে এ সমস্ত রাষ্ট্রের ভিত্তি ও হেতু এই সব রাষ্ট্র সব সময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত চরমপন্থী একদল লোক থাকে প্রভূতসংখ্যায় যারা রাষ্ট্রটিকে পুরোপুরি ধর্মরাজ্য করে ফেলার জন্য সরকারের ওপর কেবলই চাপ দিতে

থাকেন। ইহুদীদের জন্য সৃষ্ট ইসরায়েলের উদাহরণ আমার মনে পড়ছে। এই রাষ্ট্রে একটি অত্যন্ত প্রবল 'জিওনিষ্ট' উপদল আছে যারা ইসরায়েলী সরকারের উপর কেবলই চাপ সৃষ্টি করে চলেছে যাতে রাষ্ট্রটিকে পুরোপুরি ধর্ম-রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে ফেলা হয়। ইসরায়েলের আরব সম্প্রদায়ের নিশ্চয়ই কাগজে কলমে নাগরিক স্বার্থ ইত্যাদি রক্ষা করা হয়েছে কিন্তু বস্তুত তাদের অবস্থা অন্য রকম। কাজেই এই সমস্ত রাষ্ট্রে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত নন বা যারা মুক্তচিন্তায় বিশ্বাস করেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে থাকেন। হয়ত আপাততঃ 'সব ঠিকই' আছে কিন্তু যেকোন মুহূর্তে 'সব ঠিক' থাকবে না এবং আমরা এর প্রভূত উদাহরণ চোখের সামনে দেখেছি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের অন্য রকম সম্পর্কও দাঁড়াতে পারে। সমাজে গৃহীত ধর্মের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার দ্বারা রাষ্ট্র ধর্মকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। কখনো কখনো এটা প্রত্যক্ষ নির্যাতনের পথ নিতে পারে। কখনোবা ধর্মীয় আচার প্রভৃতির জন্য যে শ্রদ্ধা বা আবেগ আমরা অনুভব করি তাকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে চালিত করে দেয়া যেতে পারে, রাষ্ট্রীয় আদর্শের গৌরবায়নের কাজে লাগান হয় ধর্মীয় রীতি প্রকরণ। বাইরের ভিন্নতর সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক এ সমস্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত করে তোলা হয় এবং তার উপর আছে কড়া সেন্সরশিপের প্রহরা। আজকের পৃথিবীতে এরকম রাষ্ট্রের উদাহরণও আছে।

এর থেকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণায় উপনীত হই। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি অবশ্যই যথেষ্ট পরিষ্কার নয় এবং আমার মনে হয় এই জন্যই আজকের এই সভায় আমরা শব্দটি নিয়ে আলোচনা করছি। সেক্যুলারিজম মানে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার

করা নয় তেমনি অন্যদিকে, এবং বাংলাদেশে একথাটা বার বার বলাও হচ্ছে যে, ধর্মের উৎসাদন বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিরুৎসাহিত করাও নয়। আমি যতটা বুঝি সেক্যুলরিজম মানে আসলে সরকারকে বা রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ ধর্মের সঙ্গে একাত্ম করে না দেখে কোন বিশেষ ধর্ম'কে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে পৃষ্ঠপোষণা না করা। কাজেই আমার মনে হয় এটা বোধ হয় বলা ঠিক নয় যে, বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামিক রাষ্ট্র। অবশ্য একথা বলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র বলা যদিও এক কথা নয়। সেক্যুলর রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মীয় মতাদর্শকে প্রাধান্য দিতে পারে না। এই জাতীয় রাষ্ট্র যেমন এর শিক্ষা ব্যবস্থা বা প্রচার মাধ্যমগুলির সাহায্যে কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় আদর্শ সকলের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকেও অনুরূপভাবে এই সীমাবদ্ধতাগুলি মেনে নিতে হয়।

কিন্তু এর থেকে অনেক প্রশ্ন ওঠে যার উত্তর দেয়া দরকার। রাষ্ট্রের কি তবে কোন আদর্শ থাকবে না? এরকম কোন রাষ্ট্র কি কল্পনা করা সম্ভবপর যার কোন আইডিওলজী নেই? সেক্যুলরিজম যেহেতু কোন ধর্ম বিশেষের ওপর রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্মাণ করতে ইচ্ছুক নয়, কিসের ওপরে তবে রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তি স্থাপিত হবে?

মধ্যযুগের ক্যাথলিক খৃষ্টানরা যদিও বিধির বিধানকে আইনের ভিত্তি হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন; কিন্তু তাঁরা Natural law বা সামাজিক নীতিবোধেরও অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। এই Natural law এর ধারণার উৎপত্তি অতি প্রাচীন ইতিহাসের কুয়াশাচ্ছন্নতায় আবৃত। গ্রীকরা এই ধর্মোত্তর নীতিবোধকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। একটি সাধারণ ন্যায়বোধ এবং সকলের জন্য গ্রহণযোগ্যতার একটি যুক্তিসিদ্ধ ধারণা এই স্বীকৃতির পেছনে কাজ করেছে। এ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে, এই

বোধ সর্বজনীন এবং সর্বকালের জন্যই সত্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে পরে বহু প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সে যাই হোক, রোমানরাও এই ন্যাচুরাল ল'র ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি ক্যাথলিক ধুরন্ধর সেণ্ট টমাস এ্যাকুয়াইনাস একে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, ন্যাচুরাল ল' আসলে মানুষের যুক্তি বা বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত ভগবানেরই অভিপ্রায়। অষ্টাদশ শতকের সেক্যুলরিস্টরা একেই গ্রহণ করে নিয়েছেন—জোরটা পড়েছে এই যুক্তিগত ভিত্তিটার ওপরে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হয়ত এই 'ন্যাচুরাল ল'কে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই ধারণাটিও অস্পষ্ট এবং কখনো এর রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। ফলে এটা মূলত যতটা অনুভববেদ্য ততটা নিয়মাবলীর ব্যাপার নয়।

অন্য একটি সমস্যার দিকে তাকান যাক। যে কোন রাষ্ট্রেই যেহেতু নাগরিকেরা বিশেষ বিশেষ ধর্মের অনুসারী এবং এঁরা নিজেদেরকে দলগত ভাবেও সনাক্ত করতে উৎসাহী হবেন—কাজেই রাষ্ট্রকে এই সমস্ত ধর্মীয় দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ এড়াবার জন্যও হয়ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। ধর্ম একটি অত্যন্ত বিস্ফোরক পদার্থ, এটি আরো বেশী করে বিস্ফোরক হয়ে পড়ে যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একে অপব্যবহার করা হয়। কাজেই কোন রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে গ্রহণ করে তা হলে সেখানে ধর্মের এই জাতীয় অপব্যবহার যাতে না হতে পারে সে সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে। শুধু মাত্র ধর্মীয় সংঘর্ষ রোধ করার জন্যই নয়, সাধারণভাবেই ধর্মের নামে শোষণ বা অনাচার নিরোধমূলক আইন প্রবর্তন করতে হবে। অবশ্য আমরা এও জানি প্রকৃত প্রস্তাবে যেটা দরকার সেটা হল চিত্তের বির্বতন বা মানসিকতার পরিশোধন। কিন্তু এটা আদর্শের কথা, এমনটি সব সময় হয় না—সেজন্যেই

আইনের প্রয়োজন, আইন এখানে আমাদের প্রভূত সাহায্যে আসতে পারে।

ধর্মীয় গোঁড়ামী, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে জাতি বিদ্বেষ ও বর্ণ বৈষম্যজনিত সংঘর্ষের অনেক মিল আছে। এদের উৎপত্তি প্রায় একই রকম এবং এই দু'রকম সমস্যাও মূলত একই জাতীয় এবং সম্ভবতঃ এদের মোকাবেলাও করতে হবে একই পদ্ধতিতে। আমরা ইংল্যাণ্ডে দেখেছি যে, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই জাতি বা বর্ণ-বৈষম্য-জনিত উত্তেজনা অনেকাংশে প্রশমিত করা সম্ভবপর হয়েছে। আমাদের দেশে যেমন আমরা কেউ ইচ্ছেমত কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে কাউকে প্ররোচিত করতে পারি না ; আইনগত দিক থেকেই শাস্তির ভয় আছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান সংক্রান্ত সমস্যাটিকে রাষ্ট্র কি ভাবে সমাধান করবে ? রাষ্ট্র কি এই প্রশ্নটিকে আমলই দেবে না এবং উদাসীন থাকবে ? শিশুর ধর্মশিক্ষার ভার কি পিতামাতার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে, না কি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলি তাদের নিজেদের ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন তাদের নিজস্ব বিশেষ শিক্ষায়তনগুলিতে ? এই সমস্ত শিক্ষায়তনগুলি পরিদর্শনার ভার সে ক্ষেত্রে থাকবে রাষ্ট্রের হাতে।

এটা সত্য যে, সংখ্যালঘু সমস্যা, যা আজ একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার রূপ লাভ করেছে, সেক্যুলরিজমই তার একমাত্র গ্রহণযোগ্য সমাধান। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমস্যা যেখানে আছে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ছাড়া আর কি সমাধানই বা হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় এই সমস্যাটি ধর্মকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরোপুরি উপেক্ষা করে সমাধান করা যাবে না, এড়িয়ে যাওয়া হবে মাত্র। সমাজে স্থিত অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে আরো বেশী জানাজানির ও সুপরিচয়ের মাধ্যমেই

সহনশীলতার মনোভাব উজ্জীবিত করা যেতে পারে এবং এখানেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ভাবলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে একমাত্র নিজের ধর্ম ছাড়া অন্যের ধর্ম সম্পর্কে আমরা কতো কম জানি। অন্যান্য ধর্মাবলী সম্পর্কে কিছু সহজ তথ্য ও সাধারণ জ্ঞানের প্রসার উৎসাহিত করা যেতে পারে। এটা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হতে পারে। আমার এটা ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে, যদিও আমি নিজে খৃষ্টান তবু খৃষ্টান ধর্মই মুক্তি বা মোক্ষ লাভের একমাত্র পথ নয়। আমার আরো মনে হয় যে সব ধর্মেরই নৈতিক দিক থেকে একটা সাধারণ ভিত্তি আছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এটার উপরই জোর দেয়া উচিত। ধর্ম আমাদের চিত্তকে উদার করার কথা কিন্তু বস্তুত এর উল্টোটাই আমরা বেশী দেখি অর্থাৎ উদার করার বদলে ধর্ম আমাদের মনকে যেন সঙ্কীর্ণ করে ফেলে।

ওপরে আমি সেক্যুলরিজম সংক্রান্ত কিছু সমস্যার আলোচনা করার চেষ্টা করলাম। এটা অত্যন্ত ব্যাপক এবং কৌতূহলোদ্দীপক একটি বিষয়। আশা করছি অন্যেরা আরো অনেক দিক তুলে ধরবেন সমস্যাটির।

প্রথম দিনের আলোচনা

ডক্টর মফিজ উদ্দীন আহমদ
দর্শন বিভাগ

আমি মিসেস হোসেনের মন্তব্য—'ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক'—এর সঙ্গে একমত। ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটি শুধু দ্ব্যর্থকই নয়, কথাটি আপেক্ষিকও বটে।

কিন্তু নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি উঠছে কেন? কারণ ধর্ম আছে এবং থাকবে এটা ধরে নেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন ধর্মমত আছে বলেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উঠছে। কাজেই আমার মতে ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। কারণ, তাহলে নিরপেক্ষতার আর প্রয়োজনই হবে না।

একই কারণে এটা আপেক্ষিক। কারো কারো ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের প্রয়োজন না থাকলেও অধিকাংশের জীবনে ধর্ম রয়েছে। কাজেই সার্বিকভাবে বা আদর্শগতভাবে সমাজে ধর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সকলে একসঙ্গে সম্পূর্ণ উদাসীন নই এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তারা তা আশাও করেন না। নিরপেক্ষতা তা হলে কার জন্য এবং কিভাবে সেটা প্রকাশিত হবে? তার মানে এর ক্ষেত্রবিশেষ আছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের কথা তুললেই এই সমস্ত ক্ষেত্র, ব্যক্তি, সমাজ প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা এসে পড়ে। এ জন্যই নিরপেক্ষতার ধারণাটা আপেক্ষিক। যেমন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে এটা আমরা চাই। তেমনি একটি প্রতিষ্ঠানও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে।

ধর্মনিরপেক্ষতা অতএব একটি তত্ত্ব বা থিয়োরী ততটা নয় যতটা একটা অ্যাটিট্যুড বা মনোভঙ্গী যার একটা ব্যবহারিক প্রকাশ আছে। কথাটা বিশেষ করে উঠেছে এই জন্যে যে, পৃথিবীতে কোন সমাজেই সম্ভবত: আজ আর এক ধর্মের লোক নেই। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা একই রাষ্ট্রে ও সমাজে পাশাপাশি থাকে। তাই এটা সাধারণভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় এবং এটা বাঞ্ছনীয় ও অপরিহার্য যে, কতগুলি ব্যাপারে, যেমন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে। তার মানে এ নয় যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকতে বাধ্য হব। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস আমার নিজস্ব। কিন্তু অপরের জীবনের সীমানা ডিঙিয়ে আমার বিশ্বাস ও আচার দিয়ে তাকে বিব্রত করার অধিকার আমার থাকবে না; তারও এই অধিকার থাকবে না। এইটুকু সামাজিক সহনশীলতা ও মানসিক প্রস্তুতির দরকার আছে; তাতেই নিরপেক্ষতার গোড়া পত্তন। এই প্রস্তুতি স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে আবার সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষভাবে চেষ্টাপ্রসূত কার্যক্রমের মাধ্যমেও আসতে পারে। আজকের জটিল, দ্রুত পরিবর্তন প্রয়াসী সমাজে এই সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। এই অনুশীলনের একটি ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষায়তন ও পাঠক্রম, যে পাঠক্রমের একটি লক্ষ হতে পারে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করা। যদি একে বলেন ধর্ম-শিক্ষা তবে ঐ জাতীয় ধর্মশিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এ জাতীয় শিক্ষাই ধর্মনিরপেক্ষতাকে সার্থক করে তুলবে। শুধুমাত্র নিজের ধর্মের রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তথ্য আহরণ নয়। সমাজে অবস্থিত সবকটি ধর্ম বা সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত সত্য ও ঐক্যকে অনুসন্ধান করার কথা আমি বোঝাচ্ছি এই জাতীয় ধর্মশিক্ষার দ্বারা।

আলোচনা

অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ
বাংলা বিভাগ

মানুষ অতীত কাল থেকে যে সাধনা করছে, সে হচ্ছে মানুষ হবার সাধনা। বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব সেই সাধনারই একটা প্রকাশ। মানুষ আবহমান কাল ধরে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভেবেছে, ধর্ম সম্বন্ধেও ভেবেছে। তার সেই ভাবনা যুগে যুগে এক এক জনের হাতে বা এক একটা গোষ্ঠীর হাতে এক এক রূপ বা নাম নিয়েছে। তাদের মধ্যে তাই ঐক্য যেমন আছে, বিরোধও তেমনি আছে।

মানুষের প্রধান ধর্মগুলো সবই অত্যন্ত প্রাচীন। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এগুলো অনুসরণ করে আসছি। প্রায় সব ধর্মেই সহনশীলতা ও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সৌভ্রাত্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সৌভ্রাত্র বাড়েনি। ঐক্যর চেয়ে বিরোধই প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষ হবার সাধনা সফলকাম হয়নি। এই সত্যটা উপেক্ষা করা যায় না।

ধর্মমতগুলি যে সমাজে, যে সভ্যতায় উদ্ভূত হয়েছিল—সেই সব সমাজ ও সভ্যতা তার থেকে অনেক বদলেও গেছে। আদর্শ মানুষের ধারণাও বদলাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন আদর্শকে তুলে ধরেছে। এক ধর্মের আদর্শ অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে শ্রদ্ধেয় মনে হয়নি। মুসলমানদের কাছে একজন আদর্শ হিন্দু যথেষ্ট আদর্শ মানুষ নন, একজন খৃষ্টানের কাছে একজন আদর্শ মুসলমান যথেষ্ট শ্রদ্ধেয় নন। আবার একজন আধুনিক মানুষের কাছে এই সবকটি ধর্মীয় আদর্শই আধুনিক মানুষের সংজ্ঞার বিচারে অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে।

এর একটা প্রধান কারণ সমাজ বদলাচ্ছে। অথচ সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম বদল বা শোধন প্রায় ধর্মহীনতার নামান্তর হবে।

নিজের সনাতন ধর্মের আদর্শ যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন, কেউই তা ছেড়ে দিতে চায় না বা দেয় না। আমরা ততটুকুই অসম্পূর্ণ থাকি বা পিছিয়ে থাকি।

প্রত্যেক ধর্মের নির্দিষ্ট কতগুলি বিধান আছে— এই জিনিস পালন করা যাবে, এগুলি যাবে না। আমার ইচ্ছে হলেই আমি এই সমস্ত বিধি-নিষেধ অনুষ্ঠান সংস্কার করে নিতে পারি না। যদি সংস্কার করে নিতে না পারি তবে চোদ্দ শ বা চোদ্দ হাজার বছরের ধর্ম আজকের সমাজে কি ভাবে, কতটুকু পালন করব ? এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ তবে কি ভাবে হবো ?

সাধারণ লোক এত কিছু ভাবে না। নিরক্ষর চাষী বা শ্রমিক বা রিক্সাওয়ালাও ধর্ম পালন করে, তারও ধর্ম আছে। ভিন্ন ভিন্ন অনুশাসন, নিষেধাজ্ঞা, আদর্শ অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন করে। সে আদর্শ মুসলমান, আদর্শ হিন্দু, আদর্শ খৃষ্টান ইত্যাদি হতে চেষ্টা করে। নিজ নিজ ধর্ম পালন করে মিলনের চাইতে বিভিন্নতার দিকেই সে যায়। আচরণে বিভিন্ন ধর্মে মিল হয় না এবং মিল হয় না বলেই লোকে মাথা কাটাকাটি করে। তাই আমার প্রশ্ন সবকটি ধর্মকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করে মিলনের দিকে আমরা যেতে পারব কি ? ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত তাৎপর্য কি তাই ?

ইতিহাসের দিকে তাকালেও এই প্রশ্ন ঘনীভূত হয়। প্রায় সব ধর্মেই বলেছে, মানুষ সব ভাই ভাই। সব মানুষকে ভালো বাসো। অথচ হিন্দুরা বৌদ্ধদের গলা কেটেছে, বৌদ্ধরাও হিন্দুদের প্রতি অসহিষ্ণু হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টান জন্মশত্রু, মুসলমানে ইহুদীতেও সদ্ভাব নেই,— এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানে ইহুদীতে সংঘর্ষ চলছে। আবার একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মারামারি হয়েছে ও হচ্ছে—

শিয়া-সুন্নী, শাক্ত-বৈষ্ণব, রোমান-ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্টদের মধ্যে বিরোধ তার প্রমান।

কাজেই, সামাজিকভাবে, ডক্টর মফিজ যেমন বলেছেন, সবধর্মের মিলন যেখানে, সেই মানুষ হবার আদর্শকেই গ্রহণ করতে হবে। লোকে ব্যক্তিগত জীবনে অবশ্যই ধর্ম পালন করবে। এই সংস্কার অত্যন্ত গভীর ও প্রাচীন। এমনকি নাস্তিকও ধর্মের পরিবেশে মানুষ হয় এবং জীবনের কোন বিপর্যয় বা সংকটের মুহূর্তে তারও নিজস্ব ধর্মের আশ্রয়ের কথা মনে পড়ে। তবে সমাজ জীবনে যেখানে আরো পাঁচজনকে নিয়ে আমাদের কারবার সেখানে এই মানুষের ধর্মকেই পালন করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য এইখানেই।

নিরপেক্ষতার নামে শিক্ষাব্যবস্থায় একই সঙ্গে মাদ্রাসা, টোল বা সেমিনারীকে উৎসাহিত করে, বিশেষ বিশেষ ধর্মের ফ্যানাটিক তৈরী করে, বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা উচিত নয়। রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ।

জালাল উদ্দীন আহমদ

সামাজিক কাঠামোর মধ্যে রেখে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা করতে হবে। ধর্মীয় কার্যক্রমের মূল্য আমরা দেই, তবে ধর্মীয় উন্মত্ততা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং সাধারণ লোককে এর দুর্ভোগ বইতে হয়। এই দুঃখ-জনক অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত এবং আজকের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির সূচনা। কিন্তু এই নীতিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে গেলে এর আইনগত দিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ ইতিমধ্যেই নিজেদের

ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করেছে তাদের সব কটি দেশ সব সময় তাদের জনসাধারণকে ধর্মান্ধতা বা ধর্মীয় উন্মত্ততা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ভারতবর্ষ ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর মত লোক যেমন অন্য ধর্মীয়দের হাতে নয়, তাঁর স্বীয় ধর্মের উন্মত্ততার হাতে মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করলেন। সোয়েকারনোর মত ধর্মনিরপেক্ষ নেতার দেশে প্রচণ্ড ধর্মান্ধতার পুনঃপ্রকাশ ঘটলো।

বাংলাদেশেও আজকে ধর্মনিরপেক্ষতার মহান নীতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই নীতি সকলের কাছে মহান মনে নাও হতে পারে। প্রত্যেকেই নিজের ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে চায় ;—সে নিজে সেই ধর্মের অনুশাসন যথাযথ পালন করুক আর নাই করুক। ধর্মনিরপেক্ষতা বললে তাই সে খুশী হয় না বরং একটা চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে এটা আমরা অনুভব করছি। কাজেই বাংলাদেশ সরকারকেও একটা সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যাতে এই ক্ষোভ অমূলক বলে প্রতিপন্ন হয়।

ধর্মীয় অনুভূতি একটা জৈবিক (Physiological) অনুভূতি কিনা আমি জানি না, নাকি এটা একটা Conditioning এর ফলাফল—একটা সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত Conditioned reflex। তবে এটা দেখেছি, ধর্মীয় অনুভূতি সকল লোকের সমান নয়। ধর্মাচরণ বলতেও সকলে এক রকম আচরণ করে না। তবে সব লোকেই বিপদ ও বিপর্যয়ের মুহূর্তে ঈশ্বর বা আল্লার আশ্রয় নিতে চায়—হাসপাতালে ও যুদ্ধক্ষেত্রে এই জাতীয় ধর্মীয় অনুভূতির অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে।

রাশিয়া, চীন প্রভৃতি বস্তুতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধর্ম নিয়ে হানাহানি ও ধর্মীয় উন্মত্ততা নেই। এর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা প্রেরণা গ্রহণ

করতে পারেন। ক্রুশ্চভের ব্যক্তিগত একটি আচরণ থেকেও আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির একটু উদাহরণ পাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে ক্রুশ্চভকে একটি গীর্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হলে তিনি বলেন যে, এই বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলে তার নিজের দেশে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে যে, তিনি ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি তার দুর্বলতা সূচিত করেছেন, অতএব তিনি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনায়ক নন।

ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব জাগিয়ে তুলতে জনশিক্ষা ও পত্র-পত্রিকা, বেতার প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা আছে—বিশেষ করে ভুল বোঝা এবং বোঝানোর যেখানে এত সুযোগ আছে।

অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষ
দর্শন বিভাগ

অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা সেক্যুলরিজমের তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশের চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে। অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমদ প্রমুখ এর আপেক্ষিকতার ওপর জোর দিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয় এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতার ওপর জোর দিয়েছেন। এই অর্থ দ্বৈততা অনাবশ্যক।

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রসারের সাথে সাথে ধর্মের অনুশাসন, অনুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য কমে আসে। পারত্রিক মোহটুকু কমে যায় এবং ঐহিক দৃষ্টিভঙ্গী তার স্থান দখল করে। বৃহত্তম সংখ্যার জন্য জাগতিক

স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি, সুখ প্রভৃতির কামনা, সমাজের মানুষের জন্য মঙ্গল ইত্যাদি বিজ্ঞানবিস্তার ও যুক্তিবাদের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এই সমাজ সম্পৃক্ততা বা Social involvement সেক্যুলর দৃষ্টিভঙ্গীরও বৈশিষ্ট্য। এর ফলে আধ্যাত্মিক দিকটা উপেক্ষিত হয় সত্য কিন্তু সমাজের সর্ব মানুষের মঙ্গলের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য নীতির অনুসন্ধান প্রশ্রয় পায়। সার্বজনীন মঙ্গলে নিয়োজিত কার্যক্রম বা নীতিবোধের উদ্বোধনই সেক্যুলরিজমের লক্ষ্য। ধর্মীয় নীতিবোধ বা সনাতন নীতিবোধের আপেক্ষিকতা ধরে নিয়ে এই অন্বেষা শুরু হয়।

ফরাসী বিজ্ঞানী ও চিন্তানায়ক লাপ্লাস যখন বললেন নীহারিকাপুঞ্জ থেকে সৌরজগৎ ও সৌরজগৎ থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, নেপোলিয়ন তখন বেঁচে আছেন। নেপোলিয়ন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তো ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বললেন না?' লাপ্লাস উত্তর করলেন 'your majesty! I can do without that hypothesis'। ডারউইনতত্ত্ব সম্বন্ধে রাসেলের একটি মন্তব্য আছে যে, কেউ একই সঙ্গে নিজেকে ডারউইনীয়ান ও খৃষ্টান বলে দাবী করতে পারে না। বস্তুত এই ভাবে বিজ্ঞানচিন্তায় ঈশ্বরের প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রামাণ্য বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং অনুরূপভাবে নীতিশাস্ত্রও বিজ্ঞানের আওতার বাইরে; যদিও যুক্তির বাইরে নয়।

তবে মানবপ্রেম, মানব কল্যাণ, মানুষের জন্য সহানুভূতি, স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা এসব প্রবণতা ধর্ম কেবল খর্বই করেছে—এটা ভাবাও ভুল হবে। ধর্মই এ সমস্ত আদর্শ আমাদের শিখিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মের মহৎ দিকগুলির সঙ্গে অর্থাৎ নীতিবোধের সত্যটুকুর সঙ্গে সেক্যুলর মঙ্গলের চিন্তাকে মেলাতে হবে। ধর্মের dogma-র দিকটা গোলমেলে, জোর দিতে হবে তার Ethical ও Spiritual দিকটার ওপরে। তাহলে সেক্যুলরিজম সম্বন্ধে সন্দেহ বা ধর্মহীনতার ভয় অমূলক মনে হবে।

লুৎফুল আনিস

ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পেছনের অর্থনৈতিক পটভূমিটার ওপর আরো জোর দেওয়া উচিত। কুমারী মেরীর সন্তান লাভ, রামসীতার কাহিনীর নানা অলৌকিক ঘটনা, মুসার ঈশ্বরদর্শন প্রভৃতি অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য কাহিনীর উপর স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যে লোকে ঐ সব ধর্মে আস্থা স্থাপন করেছে তার কারণ অর্থনৈতিক। তেমনি আজ যে ধর্ম-নিরপেক্ষতার কথা উঠেছে এরও কারণ অর্থনৈতিক। বাংলাদেশের উদ্ভবই তার প্রমাণ। কাজেই অর্থনৈতিক কাঠামোকে বদলে দিতে পারলে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটি নিয়ে তর্কেরই অবকাশ থাকবে না। কারণ নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে যাবে।

নুরুল ইসলাম

ধর্মনিরপেক্ষতার জোরটা হচ্ছে মনুষ্যত্বের ওপরে। আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমিও মানুষ—এটাই মিলনের ভূমি। আমি বাঙালী, আমি মুসলমান—কিন্তু সর্বোপরি আমি মানুষ। সহনশীলতার এটাই হচ্ছে ভিত্তি। বাঙালী জাতীয়তাবাদ বললে অবাঙালী বাদ পড়ে যায়, ইসলাম ধর্মাবলম্বী বললে অমুসলমান দূরে থাকে, আমি এশীয় বললে অন্যরা অনাত্মীয় বোধ হয়—এ সমস্ত পরিচয় তাই সহনশীলতার ভিত্তি হতে পারে না—সেক্যুলরিজম সহনশীলতার অন্য নাম।

মোস্তফা কামাল

আমার দুটি প্রশ্ন আছে অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের কাছে। (১) ধর্মই কি মারামারি হানাহানির একমাত্র কারণ ? আসলে শ্রেণী-শোষণ থেকে শ্রেণীবিরোধিতা জন্ম নেয় এবং তার থেকে সংঘাত। আবার বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত থাকতে পারে। কাজেই মারামারির জন্য ধর্মই একমাত্র দায়ী নয়। (২) রাষ্ট্র যদি ধর্মকে উৎসাহিত না করে তবে কি নিরুৎসাহিত করবে ? কারণ ধর্মই যদি গণ্ডগোলের মূল কারণ হয় তবে তাকে নিরুৎসাহিত করাই তো উচিত।

অধ্যাপক শাহ্ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
অর্থনীতি বিভাগ

ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবহারিক সমস্যাগুলি জটিল। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও ব্যক্তি মানুষ তার নিভৃত জীবনে ধর্ম পালন করতে থাকবে সত্য। কিন্তু সে আবার সমধর্মীয়দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রের ওপর চাপও সৃষ্টি করতে পারে। সেটা নিভৃত থাকবে না।

ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা যেমন ধর্মহীনতা নয় তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষে উদাসীন হওয়াও চলে না। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এই জাতীয় সম্ভাব্য গোষ্ঠীস্বার্থ-প্রণোদিত চিন্তাকে নিরুৎসাহিত করে ব্যক্তিকে সর্বজনীন মনোভাবাপন্ন করে তুলতে হবে। তার একটা পথ হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে—তিনি যে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীরই হোন না কেন,— তার সামাজিক ভূমিকার

গুরুত্ব সম্বন্ধে তাকে সচেতন করতে হবে। সমাজে যে তারও চাহিদা আছে—সেটা তাকে বুঝতে দিতে হবে, তাকে সম্মান দিতে হবে। তার জীবনকে সার্থক মনে করার অবকাশ তাকে দিতে হবে। তবেই সে সমগ্র সমাজের সঙ্গে নিজের ভাবনাকে মেশাবে—অন্যথায় সে স্বীয় সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে গোপন সার্থকতা খুঁজতে চেষ্টা করবে। এই মুক্ত পরিবেশ না হলে ধর্মনিরপেক্ষতা সফল হবে না।

আশরাফ আলী বুলু

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন বা অবকাশ হত না যদি ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে আমাদের দেশে গত পঁচিশ বছর ধরে ব্যবহার করা না হত, যদি না বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে ধর্মের নাম করে যে জঘন্য ব্যভিচার হয়েছে তা না হতো।

ধর্ম সম্বন্ধে, সব ধর্ম সম্বন্ধে, জ্ঞান লাভই নানা কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে মুক্তি লাভের পথ। অন্যথায় শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূর্ণ জ্ঞান। ধর্ম সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানের অভাবের জন্যই বর্ণাশ্রম প্রথার মতো একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে ব্রাহ্মণশ্রেণী নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থার সুযোগে চিরকালের জন্য সুরক্ষিত করেছেন। ইউরোপেও শ্রেণী স্বার্থকে ধর্মের দোহাই দিয়ে গোপন করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যেও এর উদাহরণ আছে।

একটি বই না পড়ে যেমন বইটা সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান হয় না, তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা না হলে ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানে সম্ভব নয়। প্রকৃত ধর্ম

শিক্ষাই সহনশীলতার পথ। রাষ্ট্রের উচিত এই ধর্মশিক্ষার দায়িত্ব নেয়া। ধর্মশিক্ষা দ্বারা আমি অবশ্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোঝাচ্ছি না—মাদ্রাসা শিক্ষা অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছে।

তবে যে কোন ধর্মেই আদর্শ পুরুষ হতে পারলে হানাহানি হবে না। গৌতম বুদ্ধ, হজরত মুহম্মদ বা যীশুখৃষ্টের দেখা হলে লাঠালাঠি হত কি?

ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ
উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

মানুষ যদি ধর্মনিরপেক্ষ না হয় তবে মানুষকে নিয়ে যে রাষ্ট্র তা কি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে? বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের কাছে ধর্মের প্রয়োজন বা কোনো একটি নীতিতে থাকার প্রয়োজন—এটা মানুষের একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন। আগে মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করতো, এখন মানুষ ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজমে বিশ্বাস করছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্ম একভাবে না একভাবে থেকেই যাচ্ছে। কাজেই স্টেটকে সেক্যুলর বলে ঘোষণা করলেই কি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায়? পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ লোক আজ কম্যুনিজম শাসিত রাষ্ট্রে বাস করেন এবং এটা সবাই জানেন যে, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোন অধ্যাপক যদি ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে কথা বলেন তবে তার চাকরী চলে যাবে। কাজেই ধর্ম নানান রূপে আমাদের মধ্যে থেকে যায়। তাই আমি বুঝতে পারি না, আমাদের মধ্যে সত্যি ধর্মনিরপেক্ষতা সম্ভব কি না?

ধর্মের জন্য মারামারি হচ্ছে এটা প্রায় সবাই বলেন। কিন্তু জাতি-সংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি প্রতিরক্ষা খাতে বাৎসরিক মোট দু'শ বিলিয়ন ডলার খরচ করছেন। বিশেষ করে পৃথিবীর চারটি রাষ্ট্র এর সিংহভাগ খরচ করছেন। প্রশ্ন হল, এঁরা এই টাকাটা কি খরচ করছেন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য না রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য। আজকের পৃথিবীতে যে এত অসন্তোষ তার মূলে আছে রাষ্ট্র—ধর্ম নয়। ধর্ম নিয়ে যত না মারামারি হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তার চেয়ে বেশী মারামারি হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করেই কি এর সমাধান হবে, না, রাজনীতি ও রাষ্ট্র উভয়কেই বাতিল করতে হবে? রাষ্ট্র থাকলেই থাকবে রাজনীতি, রাজনীতি থাকলেই থাকবে মারামারি। সমস্যাটা ধর্ম নয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্র। আমরা যদি সত্যিকার শান্তি চাই তবে রাষ্ট্রকেই বাতিল করে দিতে হবে।

অধ্যাপক দিলীপ নাথ
অর্থনীতি বিভাগ

একই সমাজে একাধিক ধর্মাবলম্বী লোক বাস করলেই সেক্যুলরিজমের প্রয়োজন এটা ঠিক নয়, সেক্যুলরিজম মানে ধর্মনিরপেক্ষতাই শুধু নয়, চিন্তার মুক্তিও বটে। যে সমাজে শুধুমাত্র একটি ধর্মের লোক বাস করে সেখানেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন আছে।

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক
মনস্তত্ত্ব বিভাগ

ধর্মনিরপেক্ষতা নামক সহজ এবং সরল জিনিসকে জটিল আলোচনার দ্বারা অস্পষ্ট করে তোলাই এ আলোচনা সভার উদ্দেশ্য কিনা এমন

সন্দেহ আমার মনে জাগছে। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার একটা real political context আছে, এটা একটা hypothetical possibility নিয়ে আলোচনা মাত্র নয়।

আমি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছি। ধর্ম-নিরপেক্ষতা এই রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতির একটি। তার মানে আমি যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা মেনে নিয়েছি তেমনি রাষ্ট্রও অঙ্গীকার করেছে যে, আমার ধর্ম বিশ্বাসে অন্য কোনো ব্যক্তি হাত দেবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনে আমার ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার আমার থাকবে। রাষ্ট্র আমার এই অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করবে। এর উপরে যদি কোনো মহল থেকে হস্তক্ষেপ করা হয় বা বাধা আসে তবে সরকার তার বা তাদের শাস্তি বিধান করবেন। রাষ্ট্রের কাছে আমি আরো চাইব যে, আমার দেয়া ট্যাক্সের পয়সা কোন বিশেষ ধর্মের প্রচারে বা ধর্মাশ্রিত কার্যকলাপে খরচ করতে পারবে না। তার মানে রাষ্ট্র ধর্মের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারবে না। রাষ্ট্র ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন থাকবে।

কোন বিশেষ ধর্মে আসক্তি যেমন আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বিবেচিত হবে তেমনি ধর্মে অনাসক্তি বা সন্দেহবাদ বা নাস্তিকতাও আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্র এ নিয়ে সর্দারী করতে আসবে না। ব্যক্তিও নিজের সীমা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে।

অধ্যাপক আসগর আলী তালুকদার
বাণিজ্য বিভাগ

এখানে মানুষ, বাঙালী, মুসলমান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে একটা confusion of categories হয়েছে মনে হয়। আমরা সামাজিক

ভাবে বাঙালী, সত্তা হিসেবে মানুষ এবং ধর্ম পরিচয়ে মুসলমান। ধর্ম-নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত চিন্তায় এক ক্যাটেগরি অন্য ক্ষেত্রে নিয়ে গেলেই গোল বাধে। এই জন্য আইন প্রণয়ন, প্রচারমূলক কার্যক্রম ও শিক্ষাগত orientation প্রভৃতির যথাযথ প্রয়োগ দরকার।

অধ্যাপক হাসিবুল হোসেন
সমাজতত্ত্ব বিভাগ

ধর্ম ও রাষ্ট্রের আলোচনায় ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়ে নেয়া দরকার। ধর্ম বলতে আনুষ্ঠানিক ধর্ম যেমন বোঝায় তেমনি আছে মানবধর্ম। আনুষ্ঠানিক ধর্মের দুটো দিক—জাগতিক ও আধ্যাত্মিক। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হল—এটি একটি আইন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। আইন প্রণয়ন দ্বারা মানুষে মানুষে সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ (regulate) করা এর একটা উদ্দেশ্য। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, রাষ্ট্র হবে Embodiment of moral ideas এটা হচ্ছে রাষ্ট্রের আদর্শ। তাহলে দাঁড়াচ্ছে আইনের মাধ্যমে নীতির প্রয়োগ দ্বারা নাগরিকদের কল্যাণ। এই নীতিবোধের উৎস হচ্ছে মানুষের সহজাত নীতিবোধ, ধর্ম ও যুক্তি।

গ্রীস হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম সেক্যুলর রাষ্ট্র। সে আদর্শ ইউরোপে পরে বিস্তৃত হয়েছিল। আজকের প্রশ্ন হল ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশকারী যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম ইসলাম, ক্রিশ্চি-য়ানিটি ইত্যাদি আমরা পালন করি তাই কি তবে আমাদের

আইনের উৎস না মানবধর্ম ? মানবধর্ম বলতে অনেকটা যুক্তি আশ্রিত নীতিবোধ বোঝান যেতে পারে।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যদি হয় সমাজে মানুষে-মানুষে, গোত্রে-গোত্রে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিরোধ এবং সংঘাত এড়ানো, তবে আইন প্রণয়নের সময়ও ধর্মাশ্রিত (যেমন তান্ত্রিক সম্প্রদায়) বা গোষ্ঠী আশ্রিত (যেমন উপজাতীয় পাঠান) নীতিবোধের আপেক্ষিকতার কথা মনে রাখতে হবে।

অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের প্রত্যুত্তর :

জনৈক ছাত্র বন্ধু প্রশ্ন তুলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ হলেই কি সব মারামারি বন্ধ হয়ে যাবে ? আমি এমন কথা আমার আলোচনায় কোথায়ও বলিনি। তবু এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব যে, মারামারিও শুধু ধর্মের কারণেই হয় না বা অতীতে হয়নি। তবে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হলে ধর্ম নিয়ে মারামারিটা বন্ধ হয়ে যাবে। অন্তত 'হজরত বাল' নিয়ে রায়ট এখানে আর হবে না। অন্যসব মারামারির কথা আমি বলছি না—তার জন্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে হয়তো।

ধর্মের সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমি মানুষের ধর্মের কথা বলেছি। জনৈক বক্তা বলেছেন, আমরা ঈশ্বরকে নিয়ে যে সম্পর্কে পাতাই তাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। আমি বলব, তাহলে যে ব্যক্তি সদা সত্য কথা বলতে চেষ্টা করেন, সৎ জীবন যাপন করেন, পরস্ব অপহরণ করেন না তিনি কি ধার্মিক নন ? না কি যে ব্যক্তি শুধু মন্দিরে কিংবা মসজিদে নিয়ম মাফিক যায় এবং বাকি সময়টাতে উপরোক্ত সদগুণগুলির চর্চা করায় উদাসীন সেই একমাত্র ধার্মিক ?

ধর্ম নিয়ে মারামারির সঙ্গে ধর্মের কোন যোগাযোগ নেই এরকম বলেছেন কেউ কেউ এবং বিশদ করতে গিয়ে বলেছেন হজরত মোহাম্মদের সঙ্গে বুদ্ধ-খ্রীস্টের দেখা হলে নিশ্চয়ই সে সাক্ষাৎ মারামারিতে পর্যবসিত হতো না। না, তা হতো না। কারণ এ'রা মহাপুরুষ এবং এরকম অতিশয় দুর্লভ মহাপুরুষ কয়েক হাজার বছরে কয়েকজন মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, যাদের জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন আমাদের মত সাধারণ মানুষদের জন্য। অন্যথায় মারামারি হবেই। অতীতে যেমন হয়েছে। অন্যথায়, সামাদ সাহেব যেমন বলেছেন, 'সম্প্রদায় থাকলেই সাম্প্রদায়িকতা থাকবে'। আমাদের কারবার হজরত মুহাম্মদ বা গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে নয়। আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষকে নিয়ে। আমরা প্রতিনিয়ত সংকীর্ণ বুদ্ধি ও স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হই এবং ধর্মের নামে মাথা ফাটাফাটি করি। আমরা যদি বুদ্ধ বা খ্রীস্ট হ'তে পারতাম তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ না হলেও হয়তো চলতো। কারণ তাঁরা তো তাঁদের ধর্মকেই প্রচার করে গেছেন সহজ বিশ্বাসে।

জনাব এবনে সামাদ বলেছেন সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্র; তার বিলোপ সাধন করতে হবে। মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার পরামর্শ। আমার বক্তব্য —যে সমস্যার উৎস ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা না হ লে সে সমস্যার সমাধন হবে না এবং যে সমস্যার কারণ রাষ্ট্র—রাষ্ট্রকে শোধন করেই তার সমাধান করতে হবে। ধর্মই যে মারামারির একমাত্র কারণ নয় তা আমি আগেই বলেছি।

রাষ্ট্র ধর্মকে যদি উৎসাহিত না করে তবে নিরুৎসাহিত করবে কি না এরকম একটা প্রশ্ন উঠেছে। রাষ্ট্রীয় ভাবে উৎসাহিত না করার অর্থ নিরুৎসাহিত করা নয়—রাষ্ট্র এ ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত বা নিরপেক্ষ (neutral) থাকবে বলে আমি মনে করি।

সভাপতির অভিভাষণ

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
ইংরেজি বিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বক্তা দীর্ঘ দু ঘণ্টা ধরে যে আলোচনা করেছেন তার একটি নির্যাস উপস্থিত করা বা এই দীর্ঘ বাদ-প্রতিবাদ, মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য থেকে সবগুলি সূত্রকে একত্রিত করা সহজ কথা নয় এবং আমার মতে সদ্বিবেচনার কাজ হবে সে দুরূহ পথে না যাওয়া। তবে যেটা আর দশজনের মত আমারও প্রত্যাশা ছিল যে বহু মুখে উচ্চারিত এই শব্দটি—'ধর্মনিরপেক্ষতা', সেক্যুলরিজমের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা যাকে গ্রহণ করেছি—যা অত্যন্ত অর্থময় এবং ব্যঞ্জনাময়—এ সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত হ'লে অবশ্যই আমাদের পক্ষে সেটা অত্যন্ত শিক্ষাকর হবে। কারণ, প্রত্যেকেই আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ বা বিশিষ্ট নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্ত প্রশ্ন বা সমস্যার দিকে তাকিয়ে থাকি ফলে যা' হয় আমাদের বোঝার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায়।

আমি মনে করি 'সেক্যুলরিজম' শব্দটিকে আমরা যদি আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক অর্থে দেখি তাহলে সুবিধা হয়। কারণ ইউরোপেই হোক বা এশিয়ায়ই হোক—যে দিকেই আমরা তাকাই না কেন ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ দেশে এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটা দানা বেঁধেছে এবং তার একটা ঐতিহাসিক এবং সামাজিক কারণ অবশ্যই আছে। যেমন অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে Enlightenment (যুক্তিবাদ) এর যুগে এই জাতীয় ধারণা দানা বেঁধে ছিল। কেন বেঁধে ছিল সেটা খোঁজ করলে আমরা দেখব, তার অতীতের শতাব্দীগুলিতে ইউরোপে

অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী এবং রক্তক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধ বা ধর্মীয় সংঘাত হয়ে গেছে। পটভূমিতে রোমান ক্যাথলিজমের সঙ্গে প্রটেষ্ট্যান্টিজমের এবং আবার প্রটেষ্টান্টিজিমের বিভিন্ন Denominaiton (উপদল) এর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এবং তার সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ধর্মমতগুলির একটি বা অন্যটিকে রাজধর্ম বা রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলী না থাকলে এই ধারণাও এরকম কম পুষ্টি লাভ করত না। কোন প্রাচ্য দেশে এর নজীর আছে কি না আমার জানা নেই। অন্ততঃ ভারতবর্ষে কখনো কোন ধর্মকে অনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বা রাষ্ট্রীয় চার্চ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে—এমনটি ইতিহাসে কখনো দেখিনি।

তাই আমাদের দেশে এই নিরপেক্ষতার ধারণাটি একই ভাবে সুদূর অতীতে জন্ম নেয়নি।

তবে আবার অন্য দিকে ইউরোপের এই অতীত অভিজ্ঞতা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার ঐতিহ্যের জন্য আজকের ইউরোপে যদি কোন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় তবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নতুন করে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে এ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য আমাদের অব্যবহিত পশ্চাতের, নিকট অতীতের যে ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা—তা দায়ী। ভারতীয় উপমহাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে এই বিরাট ভূখণ্ডে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি থেকেছে, কখনো কখনো বিরোধ বা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি তা' আমি বলব না কিন্তু ইউরোপে যা হয়েছে, যে রক্তের সমুদ্র বয়ে গেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে—সেরকম তুলনীয় কিছু ভারতীয় উপমহাদেশে হয়েছে এমন দেখিনা।

তবে সাম্প্রতিক কালে বিশেষ করে বিংশ শতকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যাবলীকে আশ্রয় করে এই ভারতবর্ষেই

দু'টি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মন কষাকষি, তিক্ততা এবং বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ আবার এই দুই সম্প্রদায় অধ্যুষিত বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতায় ধারণা জন্ম লাভ করেছে। এই ধারণাটি শূন্যের ওপর ভেসে আসেনি। আমাদের অতি সাম্প্রতিককালের ইতিহাস যা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিল— সেই সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকেও জন্ম দিয়েছে।

কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতা একটি ব্যবহারিক ধারণা এবং সেদিক থেকেই একে সফল করে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় অধিবেশন

বিষয় : ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ

সভাপতি : প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ

প্রবন্ধ পাঠ : অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ ও ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ

আলোচনা : অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী অধ্যাপক বজলুল মবিন চৌধুরী, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক আসগর আলী তালুকদার, নুরুল আমীন মজনু, অধ্যাপক আলী আনোয়ার, অধ্যাপক আবদুল খালেক, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রশান্তকুমার চক্রবর্তী, মোহাম্মদ ইউনুস আলী, আবদুর রহমান সরকার, মোস্তফা কামাল, তপন রুদ্র মজহার হোসেন, সৈয়দ আবদুল মান্নান ও আরো অনেকে।

সভাপতির পূর্বভাষণ

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনে এমনকি দায়িত্বশীল মহলেও সুস্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। যার ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত ভাবে পালিত হচ্ছে না। এ অবস্থা আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্যও আশঙ্কাজনক, কারণ গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল ধর্মনিরপেক্ষতা।

গতকালের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি ধর্মনিরপেক্ষতা একটি নীতি মাত্র নয়, এটি একটি অ্যাটিচ্যুড ও আচরণ। গতকালের আরো সিদ্ধান্ত যে, রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা করবে না। এই প্রেক্ষিতে আজকের আলোচনা শুরু হচ্ছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ

অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ :
বাংলা বিভাগ

[ভূমিকা : আমার প্রবন্ধের দু'টি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে আমি আলোচনা করেছি কিভাবে গত পঁচিশ বছর ধরে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে একটি ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা জন্ম নিল এবং বিকাশ লাভ করল এবং দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা করেছি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা কিভাবে কতটুকু পালিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ কী।]

১৯১৯ এর মার্চ মাসে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাদের যখন লড়াই লাগলো তখন থেকে, এমন কি বোধ হয় লড়াই শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব থেকে, আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা বলতে আরম্ভ করেছেন যে, তাঁরা অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী এবং পাকিস্তানের ভিত্তি যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর সেটা ছিলো ঘোর মিথ্যা। অতিশয়োক্তি বাঙালিদের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা। সে জন্যেই আমরা হঠাৎ অতো বড়ো একটা অমূলক দাবি করে ফেলি যে, আমরা একান্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। এমন কি আতিশয্যবশত একথাও ভুলে যাই যে, আমরাই পঁচিশ বছর আগে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলুম। সেদিন এদেশের আপামর প্রায় সব মানুষই বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষে মুসলমানরা একটা স্বতন্ত্রজাতি আর একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের তাঁদের আছে জন্মগত অধিকার। ধরে বেঁধে আমাদের কেউ মধ্য-প্রাচ্যের

একটি জাতির—যাঁদের পোশাক, পরিচ্ছদ, রুচি, রুজি, ভাষা, সংস্কৃতি সব ভিন্ন রকমের—তাঁদের সঙ্গে একই জোয়ালে জুড়ে দেয়নি। আমরা স্বেচ্ছায়ই তাঁদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলুম—ভাই বলে স্বীকার করে নিয়েছিলুম। আমাদের সঙ্গে তাঁদের মিল ছিলো কেবল ধর্মের, তাঁরা আমাদের ধর্মের ভাই।

সেদিনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একথাটা ছিলো সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু ইতিহাস সৌভাগ্যক্রমে একঠাঁই দাড়িয়ে থাকে না। সে নিয়ত চলছে সামনের দিকে। কখনো কখনো কেউ কেউ চেষ্টা করেন ইতিহাসের চাকাকে আটকে দিতে, অথবা উজান পথে চালাতে। কোনো কোনো আত্মতুষ্ট ব্যক্তি কখনো কখনো ভাবেনও যে, তাঁরা বোধ হয় ইতিহাসের গতিকে রুদ্ধ কিংবা বিচলিত করতে পেরেছেন! কিন্তু ইতিহাস তখন, প্রকৃতপক্ষে, অশ্রুত অট্টহাস্যের সঙ্গে এগিয়ে চলে। পরিণতিতে একদিন আইয়ুব খান-মোনেম খান-ইয়াহিয়া খান-ভুট্টো সাহেবরা আবিষ্কার করেন যে, ইতিহাসের গতি তাঁরা রোধ করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁরা গুঁড়িয়ে গেছেন তার চাকার তলায়। জনাব জিন্নাহ্ কদিন আগেও এদেশের জাতির জনক ছিলেন। তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্বকে পরবর্তী নেতারা বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণ কোশিশ করেছেন—আখেরে লাভ হবে বলে। কিন্তু পারেননি। মহাকালের তুলনায় অত্যল্প কালের মধ্যে দ্বিজাতি-তত্ত্ব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এই ব্যর্থতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। খুঁজতে গেলে সে ধারার একটি উন্মেষ যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি তার বিকাশের পথটাও অনাবিষ্কৃত থাকে না। শুরুতেই বলেছি, আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি ছিলো ধর্ম। নানা ঐতিহাসিক কারণে তখন সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের সমকক্ষতা ছিলো না। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়

একজন ছিলো মহাজন, অন্যজন খাতক ; একজন জমিদার, অন্যজন রায়ত, একজন শিক্ষিত, অন্যজন নিরক্ষর। সমাজের এই উঁচু নীচু পথে মহাকালের রথ বেশি দিন চলতে পারে না। সে জন্যেই ১৯৪৭ সালে ভেঙে পড়েছিলো কনগ্রেসের তথাকথিত সেক্যুলার স্টেটের পরিকল্পনা। জন্ম নিয়েছিলো সমাজের নীচু তলার মানুষদের এক ঐক্যজোট। এই মানুষগুলো সেদিন কিন্তু ঠিক শ্রেণী সচেতনতা থেকে ঐক্যবদ্ধ হননি, কেননা সে শিক্ষা ও সচেতনতা তাঁদের ছিলো না ; তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক সচেতনতা থেকে। অবশ্য এর পেছনে কাজ করেছে সমাজ-অর্থনৈতিক বৈষম্যই। তবে সেদিন তাঁদের যাঁরা ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা তা করে ছিলেন ধর্মেরই নামে।

ধর্মের নামে মিলিত হয়ে পূর্ববাংলার মানুষেরা ভেবেছিলেন এবারে তাঁদের অবস্থার উন্নতি হবে। ইসলামের সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসারে এবারে সুবিচার পাবেন তাঁরা। কিন্তু পাকিস্তান লাভের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁদের প্রত্যাশায় ঘা লাগলো। কি ? না, দেশের অধিকাংশ মানুষ যে-ভাষায় কথা বলেন, গণতান্ত্রিক দেশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সে ভাষা স্বীকৃতি পাবে না, রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু এটাকে ঠিক ইসলামি ন্যায়বিচার বলে চালানো গেলো না। সুতরাং পাকিস্তানের জন্মের সাত মাসের মধ্যে বাংলা ভাষার আন্দোলনে ঢাকা এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থান বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। মুহম্মদ আলি জিন্নাহ সে সময়ে এসেছিলেন ঢাকা সফরে, পিতার চোখ রাঙানিও সে বিক্ষোভকে অবদমন করতে পারলো না। আরো সাত মাস পরে এলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান। তিনিও শুনলেন, ছাত্ররা অখুশি।

কিন্তু, তবু, আরো চার বছরের আগে এ আন্দোলনটা রীতিমতো দানা বাঁধতে পারেনি। তারপর এক ফেব্রুআরি মাসে অগ্ন্যুৎপাতের

মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো ভাষা-আন্দোলন। তার লাভাস্রোতে চাপা পড়লো দ্বিজাতিতত্ত্ব, জন্ম নিলো ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা; স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় চিড় ধরলো, সূচিত হলো গণতান্ত্রিক সংগ্রাম; সংস্কৃতিক্ষেত্রে মোল্লাপুরুতের দাড়ি-টীকি ঢাকা পড়লো, এক সেক্যুলার সংস্কৃতির বীজ রোপিত হলো।

আসলে ভাষা-আন্দোলন আলাদা-আলাদাভাবে রাজনৈতিক স্বাধিকার তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বাঙালি জাতীয়তার আন্দোলন এবং অসাম্প্রদায়িকতার আন্দোলন। আর একত্রিতভাবে ভাষা-আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন—কেননা, যথার্থ গণতন্ত্রে সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মের কোনো আলাদা আসন নেই; কেননা, গণতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের কোনো বিরোধ নেই; কেননা, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। বস্তুত পক্ষে, ভাষা-আন্দোলন যেদিন শুরু হলো সেদিনই বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এবং পাকিস্তানের পতন আরম্ভ হয়েছে। তারপর ভাষা-আন্দোলনই ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬২, ১৯৬২ এবং ১৯৬২-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিণতিতে পৌঁছেছে।

একটা দিন ছিলো যখন বাঙালি মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গর্ব করা দূরে থাক, বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকার করতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হতেন। বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু না বাংলা এ নিয়ে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ-তিরিশ বছর পর্যন্ত যথেষ্ট বিতর্ক চলেছে। মুসলমানদের সে সময়কার সাময়িকপত্রসমূহে তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর আছে। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ভাষা-আন্দোলন শুরু হবার পর মুসলমানরা বাংলাকে কেবল যে তাঁদের মাতৃভাষা বলেই স্বীকার করলেন তা-ই নয়, উপরন্তু বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য নিয়ে তাঁরা রীতিমতো গর্ব প্রকাশ করেন। এবং এ ভাষার অধিকার কেড়ে আনার জন্যে তাঁরা জান পর্যন্ত কবুল করলেন।

এই ভাবে বাংলা ও বাঙালিত্ব নিয়ে আন্দোলন শুরু করার পরেই তাঁরা দেখলেন, তাঁদের পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই-এরা যদিও মুসলমান, কিন্তু তাঁদের ভাষাটা আলাদা। দেখলেন, পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতিচিন্তায় মিল সামান্যই। প্রকৃত পক্ষে, অনেক অমিল সম্পর্কেই তাঁরা সচেতন হলেন। মিল খুঁজে পেলেন কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ধর্মীয় ঐক্য সত্ত্বেও, পশ্চিম পাকিস্তানিরা ইসলাম ধর্মীয় সাম্য-মৈত্রীর আদর্শের দ্বারা চালিত হয়ে বাঙালিদের ন্যায় অধিকারকে স্বীকার করছে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবিচারের মুখে কদিন টিঁকে থাকে ধর্মের এই ঠুনকো ঐক্য? সুতরাং, একদিন, আমরা যাঁদের পরম আত্মীয় বলে মেনে নিয়েছিলুম, তাঁদের প্রতি আমাদের বাঁধন ধীরে ধীরে আলগা হলো।

কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম এই যে, নদীর এক তীর ভাঙলে অন্য তীর গড়ে উঠে। এই স্বাভাবিক নিয়ম মেনে অতঃপর অন্য দিকের ছিন্ন সম্পর্কে আবার জোড়া লেগেছে, ফলে নতুন মৈত্রী এবং সমঝোতা বেড়ে উঠেছে নতুন উপলব্ধির পলিতে-গড়া সত্যের মাটিতে।

একদিন অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক অবদমন এবং সামাজিক বৈষম্যের মুখে আমরা হিন্দুদের প্রতি বিরূপ ছিলুম। প্রবল বিদ্বেষের সেই ক্ষণে একথাটা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলুম যে, ধর্মের অমিল এবং সামাজিক অসাম্য সত্ত্বেও, হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিতে ঐক্য ছিলো যথেষ্ট। সে ঐক্য প্রতিফলিত হয়েছে এ দেশের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, জ্যোতিষ এবং ইতিহাস চর্চায়। সে সমন্বয় প্রতিবিম্বিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনে, কবীর-দাদু-লালন শাহ-মদন-হাসান রাজার বাউল সাধনায় এবং অসংখ্য সহজিয়ার দর্শনে।

এই ঐক্যসূত্র ধরেই পূর্ব বাংলার মুসলমানরা আবিষ্কার করেন, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, আবহমান বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের মিল অনেকখানি।

এই নতুন পাওয়া যুক্তিবাদী এবং উদার দৃষ্টি দিয়ে, বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের দেখতে পেলেন যথার্থস্বরূপে। তাঁদের দৃষ্টি আরব-ইরানের খেজুরতলা থেকে ঘরমুখো হলো ; বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়, তাঁরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন। ধর্মের দ্বারা নিজেদের জাতীয়তাবাদকে শনাক্ত করার প্রবণতা তাঁদের হ্রাস পেলো। তার পরিবর্তে, তাঁরা নিজেদের চিহ্নিত করলেন বাঙালি বলে।

একবার ধর্মের আচ্ছন্ন দৃষ্টি কাটিয়ে ওঠাই শক্ত। কিন্তু উঠতে পারলে তখন মানুষ আর কথায় কথায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতিতে ধর্মকে টেনে আনে না। ধর্ম থাকে তাঁর ব্যক্তিজীবনে, এবং পালপার্বণরূপে সমাজজীবনে। এজন্যেই দেখতে পাই, ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে ধীরে ধীরে এদেশের মুসলমানরা গাইতে শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথের গান—আমার সোনার বাংলা, ডি. এল. রায়ের গান—ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা, অতুলপ্রসাদের গান—মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা। রবীন্দ্রনাথ, ডি. এল. রায় এবং অতুলপ্রসাদের ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁদের সাহিত্যিক গুণাগুণ বিচারে আর প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি।

বস্তুত পক্ষে, বাঙালি হতে গিয়ে আমরা অসাম্প্রদায়িক হয়েছি ; অসাম্প্রদায়িক হওয়ার ফলে বাঙালি হতে পেরেছি এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে গিয়ে, সব-ধর্মে-বিশ্বাসী মানুষদের সমান মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা পেয়েছি।

অসাম্প্রদায়িক হতে পারার আরো কারণ ছিলো—সেগুলো প্রধানত শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক। এদিকে শিক্ষা এবং অর্থনীতিও পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত—সুতরাং বলা যেতে পারে, জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক আদর্শ ছাড়া, অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের অন্য প্রধান কারণ হলো অর্থনৈতিক।

আগেই উল্লেখ করেছি, দেশবিভাগের পূর্বে এ অঞ্চলের মধ্য- ও উচ্চবিত্তের অধিকারীরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু, মুসলমানরা ছিলেন নিম্ন-বিত্তের অধিকারী। সুতরাং, সম্প্রদায়হিশেবে মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা শোষিত ছিলেন। তা ছাড়া, হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এতো নগণ্য ছিলো যে, তাঁরা একটা প্রবল হীনমন্যতায় সর্বদা কাতর থাকতেন।

দেশবিভাগের পরে অবস্থা গেলো পাল্টে। সমর্থ ও প্রচুর সংখ্যক হিন্দুদের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমে গেলো এবং বাড়লো প্রচুর সুযোগ। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা দ্রুত এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই অগ্রগতির পরিমাণটা বোঝা যাবে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সাল এই পাঁচ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ও আসামের গড়পড়তা ৭ হাজার করে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন। তুলনায় ১৯৭৪ সালে গৃহীত ১৯৭৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় একমাত্র পূর্ব বাংলা থেকেই মোট ৩ লক্ষ মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। তার মানে ৩০ বছরের মধ্যে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় পঞ্চাশ গুণ। এই মুসলমানরা শিক্ষিত হয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই অর্থনৈতিক দিক দিয়েও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরির ক্ষেত্রে বর্ধিত সুযোগ-সুবিধের মুখে ধীরে ধীরে একটি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে। হিন্দুরা আর তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গণ্য হলেন না ; কিংবা হিন্দুদের তুলনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়েও তাঁরা পিছিয়ে থাকলেন না। ফলে, উভয় সম্প্রদায়ের ভেতরকার বিদ্বেষ স্বভাবতই হ্রাস পেলো। তা ছাড়া, শিক্ষা বিস্তারের ফলস্বরূপ মুসলমান-সমাজ মনের ঔদার্যও স্বীকরণ করলেন। হোক না মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক পাঠক্রম আর পাঠ্যপুস্তক, তবু এই শিক্ষার পথ ধরেই দৃষ্টির প্রসারতা এসেছে।

অবশ্য বলা যায়, শুধুমাত্র শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারাই মুসলমানরা হয়তো এতো শীঘ্র অসাম্প্রদায়িক এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী হতে পারতেন না। পরিবর্তনটাকে আসলে দ্রুত করেছে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ। সেই শোষণের অনিবার্য ফলস্বরূপ আমরা জোট বেঁধেছি,—কিন্তু কী বলে? মুসলমান বলে? তা হলে তো ওদের থেকে পার্থক্য দেখানো চলে না অথবা উদ্‌বুদ্ধ হওয়া যায় না প্রবল এক জাতীয়তাবাদী ঐক্যবোধের দ্বারা! সুতরাং, আমরা বলেছি, আমরা বাঙালি, সেই আমাদের প্রথম এবং সব চেয়ে বড়ো পরিচয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে, পশ্চিমী কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এক লাখ নরপশু লেলিয়ে দিয়ে যেভাবে ধর্মের নামে চরম অধর্ম করেছে, সে-ও একটা কারণ, যা আমাদের আস্থাহীন করেছে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি।

এই হচ্ছে বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক চেতনা তথা ধর্মনিরপেক্ষতার উন্মেষ ও বিকাশের গোড়ার কথা। এই পথেই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্ম॥

কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতিহিশেবে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করার পরে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে মাত্র ন মাস, এরই মধ্যে আমাদের সামাজিক জীবনে এমন সব লক্ষণ ফুটে উঠেছে যাকে সুস্থ মানসিকতার প্রকাশ বলে মনে করতে পারিনে। আইয়ুব-ইয়াহিয়ার আমলে আমরা যেমন অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথায় সোচ্চার হয়েছি, ধর্মনিরপেক্ষতার এ কালে তেমনি অনেকেই সাম্প্রদায়িক আচরণ করছি। অবশ্য সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এ দেশের সব মানুষ লড়াই-এর আগে যেমন অসাম্প্রদায়িক হতে পারেননি, তেমনি লড়াই-এর পরে পরিবর্তিত পটভূমিতে অনেকেই আবার নতুন করে সাম্প্রদায়িক হয়েছেন, অথবা বিশেষ পরিবেশে তাঁদের মধ্যকার যে সাম্প্রদায়িক চেতনা ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তা-ই আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

১৯৪৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলেন শতকরা ৮২ জন। এঁরা তাই বলে সবাই অসাম্প্রদায়িক নন, এমন কি সবাই বোধ হয় বাংলাদেশও চাননি—চেয়েছিলেন স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব পাকিস্তান। শতকরা চারজন ভোট দিয়েছিলেন ন্যাপকে। আর বাকি শতকরা চোদ্দ জন ভোট দিয়েছিলেন ইসলাম-পসন্দ্ দলগুলিকে। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এ দেশের শতকরা ১৪ জন মানুষ রীতিমতো ধর্মীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আপন ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা নিশ্চয় আরো বেশি। এঁদের সংখ্যা যদি শতকরা আরো মাত্র ১৪ জন হয়—তা হলেও দেশের কমপক্ষে শতকরা ২৮ জন ধর্মান্ধ। তার মানে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশের ২ কোটি ১০ লাখ মানুষ এখনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়তে প্রস্তুত নন।

ভারতের সঙ্গে অর্থাৎ হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন ও অর্থ নৈতিক সহযোগিতা স্বীকার করার পরে পূর্বোক্ত ২ কোটি ১০ লাখ এবং আরো অনেকে একটা নিরাপত্তাহীনতার মানসিকতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, বাংলাদেশ হয়তো ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভারতের কুক্ষিগত হবে এবং অর্থ নৈতিক দিক দিয়েও ভারতের বাজারে পরিণত হবে। এবং তার ফলস্বরূপ বিভাগ-পূর্ব দিনগুলির মতো হিন্দুরা পুনরায় প্রাধান্য পেয়ে বসবেন এবং মুসলমানরা শোষিত হবেন। এই আশঙ্কা থেকে দেশের অর্ধেক লোকই হয়তো এক নয়া-সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। বর্তমান সময়ের ক্রমবর্ধমান ভারত-বিরোধী মনোভাব আসলে এই সাম্প্রদায়িকতারই ঘোমটা-পরা আর এক রূপ।

প্রকৃত পক্ষে, বাংলাদেশ সরকার যখনি ঘোষণা করেছেন যে, এ দেশের নাম ইসলামিক রিপাবলিক—রিপাবলিক হলে নানা ধর্মের মানুষের

যে-দেশে বাস তা তত্ত্বত কখনোই ইসলামিক হতে পারে না—ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ হবে না—উপরন্তু তা হবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক, সেই মুহূর্তেই এ দেশের জনগণের একটা বিরাট অংশ আঁতকে উঠে ভেবেছেন, ইসলাম বোধ হয় বিপন্ন হলো। অতঃএব জেহাদ শুরু করো। সেই জেহাদই শুরু হয়েছে নানা পথে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ভাসানী সাহেব দীর্ঘকাল আগে থেকে বামপন্থী রাজনীতিক মতবাদ প্রচার করে আসছেন, এমন কি এ-ও বলা যায়, কখনো-কখনো তিনিই বামপন্থী রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ হঠাৎ তিনি তাঁর মত রাতারাতি বদল করতে পারেন না। সুতরাং, জেহাদের কথা মনে রেখেই তিনি তাঁর নীতির কিঞ্চিৎ সংশোধন করে বলেছেন, আমরা ইসলামি সমাজ-তন্ত্র চাই। সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন, এরকমের সোনার পাথরের বাটি কোথাও নেই, থাকতে পারে না। আসলে তিনি সমাজতন্ত্রের নামে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করেই ক্ষমতা দখলের শর্ট-কাট পথ খুঁজছেন। তাঁর এই মানসিকতা অভ্রান্তভাবে প্রকাশ পায়, যখন তিনি বলেন, যেহেতু এদেশের ৮৬ জন মানুষ মুসলমান (কথাটা ঠিক নয়), সুতরাং শাসনতন্ত্র হবে ইসলামি।

বাংলাদেশ সরকার যে সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তার সদস্যরা হঠাৎ রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন, এমন মনে করলে ভুল হবে। এঁরাই কেউ ভাসানী সাহেবের পতাকার নীচে, কেউ মুজাফফর সাহেবের পতাকার ছায়ায়, কেউ-বা আওয়ামী লীগের নামে—আপনার সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প সমাজে ছড়াচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যেও ঘটেছে এ ব্যাপারটা—ইসলামি নীতিতে বিশ্বাসী ছেলেরা আজ অন্য দলের সঙ্গে মিশে কেবল সে দলকে জয়ী করাননি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চির-দিনের প্রগতিশীল চরিত্রকে পর্যন্ত বিচলিত এবং বিভ্রান্ত করেছেন। আমাদের

সমাজের জন্যে এর থেকে বড়ো দুর্ভাবনার ও দুর্ভাগ্যের বিষয় আর নেই। যে প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে পূর্ব বাংলার সকল আন্দোলন পরিচালনা করেছেন—এক কথায় জন্ম দিয়েছেন বাংলা দেশের, তাঁরা যদি ক্ষমতার লোভে কম্‌প্রোমাইস করেন প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে, তার চেয়ে নৈরাশ্য ও বেদনার আর-কিছু থাকতে পারে না। অতঃপর আমরা অন্য কারো ওপর ভরসা কিংবা আশা করতে পারবো না।

ভাবলে অবাক হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্ররা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যে দাবি করছেন। তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন, এর যথার্থ ফলটা কী? একদিকে টোল এবং মাদ্রাসা থেকে বছরে বছরে যে ধর্মান্ধ কিছু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ আমরা তৈরি করবো, তাঁরা ক্রমশ খর্ব করবেন আমাদের দেশের উদারতা ও মুক্তিবুদ্ধির সাধনাকে। অপর পক্ষে, সরকারের কী অধিকার আছে জনগণের অর্থ ব্যয় করে একদল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক তৈরি করার? যাঁরা পাস করে বেরোবেন টোল অথবা মাদ্রাসা থেকে, যুগের অনুপযোগী শিক্ষা নিয়ে তাঁরা কি বর্তমান জগতের জীবিকার কঠিন সংগ্রামে টিঁকে থাকতে পারবেন? ইতিহাস কী প্রমাণ করে আমাদের কাছে? আসলে, ১৭৮১ সালে যেদিন কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হলো মুসলমানদের জন্যে, সেদিনই মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অন্তত এক শতাব্দী পিছিয়ে পড়লেন। পুরো ইংরেজ রাজত্বে সেই পশ্চাৎপদতা মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সম্ভবত আজও পারেননি। তা হলে এখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা কেন ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে গিয়ে মধ্যযুগীয় শিক্ষায় একদল অযোগ্য অর্ধশিক্ষিত মানুষ গড়ে তুলি? সেটাতো শুধু সেই মানুষের পক্ষেই নোকশানের নয়, সেটা সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজের পক্ষেই নোকশানের। মানুষের শক্তির এমন করুণ অপচয় কেন করবো আমরা, যখন ইতিহাস আমাদের

ভিন্নরূপ শিক্ষা দিচ্ছে ! নিরেট অপরিণামদর্শী ও আত্মহননে উন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ-তো ইতিহাসের শিক্ষাকে অমান্য করে না।

আমাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে, প্রকৃত পক্ষে, এক নয়া-সাম্প্রদায়িকতা কেবল ইসলামি সমাজতন্ত্র আর মাদ্রাসা শিক্ষার নামেই আত্মপ্রকাশ করেনি—সে রীতিমতো প্রকাণ্ড বেড়াজাল মেলে আমাদের মুক্ত বুদ্ধিকে বেড়া দিতে এগিয়ে আসছে।

আমার কাছে সব চেয়ে অসঙ্গত ঠেকছে, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ সরকারের বহুতর নির্ভুল সাম্প্রদায়িক আচরণ। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের সকল ধর্মীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকার কথা। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং খ্রীস্টান সব ধর্মের লোকই আছে আমাদের দেশে। সরকার এর কোনো ধর্মের যেমন পৃষ্ঠপোষকতা করবেন না, তেমনি কোনো ধর্মের প্রতি বিরূপ হবেন না—এই পক্ষপাতহীনতাই ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের কাছ থেকে মানুষ আশা করে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার বিশেষ ধর্মের প্রতি এবং সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছেন। এই পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্ম ও আনুষ্ঠানিকতায়। এ জন্যেই ধর্ম-নিরপেক্ষ বাংলাদেশের ক্যাডেটদের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান প্রায় ইসলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। অথচ অন্য কোনো দেশে—মায় আরব দেশগুলিতে সৈন্যদের অনুষ্ঠান বোধ হয় কোরান পাঠ দিয়ে শুরু হয় না। অসঙ্গতি অন্যত্রও দেখতে পাই। সরকার সাম্প্রদায়িক দলগুলি নিষিদ্ধ করেন বটে, কিন্তু আওয়ামী ওলেমা পার্টি বহাল তবিয়তে থাকেন। আরো দৃষ্টান্ত আছে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তি-জীবনে যে ধর্মেই বিশ্বাস করুণ না কেন, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার সময়ে তিনি যদি বারংবার বিশেষ ধর্মীয় শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন (যেমন ইনশা আল্লাহ), তা হলে ধর্মনিরপেক্ষতার স্পিরিট ক্ষুণ্ণ হয় কিনা, সেটাও

ভেবে দেখবার মতো বিষয়। আল্লাহ, গড, বা ভগবানের নামে বারবার শপথ করলে তখন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্বস্তি কিংবা আত্মবিশ্বাস ফিরে পান কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। এ ছাড়া, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশের জাতীয় প্রচারযন্ত্র—রেডিও এবং টেলিভিশন, অনুষ্ঠান শুরু করে কোরান পাঠ দিয়ে, শেষ করে 'খোদা হাফেজ' বলে। এটা কোন ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা? প্রশ্নটা আরো প্রবল হয়ে দেখা দেয় এ জন্যে যে, বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে এ প্রচার-যন্ত্র থেকে মাসাধিক কাল অনুষ্ঠানের শেষে 'খোদা হাফেজ' বলা হতো না, বলা হতো কেবল 'জয় বাংলা'। কোরান পাঠ এবং খোদা হাফেজের সঙ্গে খানিকটা গীতা, ত্রিপিটক আর বাইবেলের ভেজাল মিশিয়ে দিলেও, আমাদের ধারণা, তা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায় না, বরং তাতে করে দেশের ধর্মীয় চরিত্রটাই বিশেষভাবে প্রবল হয়ে ওঠে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের আচরণেও এই অসঙ্গতি দুর্লক্ষ নয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান নেতা। কিন্তু, তবু, প্রধানমন্ত্রী হিশেবে তিনি যখন মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদের ধর্মের উন্নতি বিধান করতে হবে এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা করবেন সরকার'—তখন তিনি অজ্ঞাতেই একটি ধর্মের প্রতি পক্ষপাত দেখান। এমন কি, তিনি যখন গণভবনে মিলাদের মহফিল ডাকেন তখনো একই রকমের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়।

অন্যান্য মন্ত্রীদের আচরণেও এরূপ অসঙ্গতি চোখে পড়ে। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা যে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারেন এবং সে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারেন। এমন কি, বিশেষ কোনো মন্ত্রী যদি ধর্মে বিশ্বাসী না-হন, সেটাও তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কিন্তু তাঁদের পাবলিক-লাইফে, তাঁদের বক্তৃতায় বিশেষ ধর্মীয় প্রীতি প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। ধরা যাক, একটি দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর রোগমুক্তি নিয়ে মন্ত্রীরা যে-ভাবে প্রকাশ্যে মোনাজাত করেছেন এবং তার ছবি ও খবর যে-ভাবে দিনের পর দিন সরকারি প্রেসে ছাপা হয়েছে; তাতে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে কেউ কেউ হয়তো কটাক্ষ করতে পারেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা কি প্রিয় নেতার জন্যে প্রার্থনা করবো না? উত্তরে বলতে হয়, নিশ্চয় করবো, বহুবার করবো; তবে মন্ত্রী হিশেবে প্রকাশ্যে প্রার্থনা করলে সকল ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে মিলিত ভাবে প্রার্থনা করবো—তার মধ্যে বিশেষ কোনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার আমদানি করবো না। আর আমি যখন আমার ধর্মসভায় যোগ দেবো কিংবা ব্যক্তিজীবনে প্রার্থনা করবো, তখন বিশেষ ধর্মীয় রীতিতে প্রার্থনা করবো। দিনের পর দিন পত্রিকায় মন্ত্রীদের মোনাজাতের ছবি ফলাও করে ছাপা হলে, সন্দেহ হয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আন্তরিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা উভয়ই বোধ হয় খর্বিত হয়। আর যদি ইসলাম ধর্মের কথা ওঠে, তা হলে তো সরাসরি বলতে হয়, মোনাজাতের ছবি তোলা জায়েজ নেই (কোনো ছবি তোলাই জায়েজ নেই)। আসলে মন্ত্রী অথবা নেতা এবং সাধারণ মানুষে পার্থক্য অনেক; এঁদের মধ্যে তুলনা চলতে পারে না। এ জন্যেই সাধারণ মানুষ যত্রতত্র যৌনসম্পর্কে রাখলে তা দূষণীয় হয় না, কিন্তু অনুরূপ কাজের জন্যে প্রফুমোর মতো মন্ত্রীদের সরে দাঁড়াতে হয় পাবলিক-লাইফ থেকে।

মোনাজাতের ঘটনাটা যদি-বা যুক্তিতে টিঁকে যায়, একজন মন্ত্রীর এক অদ্ভুত ও মারাত্মক ঘোষণা কিছুতেই টেঁকে না। তিনি সম্ভবত ইসলাম-প্রীতি প্রকাশের জন্যে এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, এ দেশের সংবিধান কোরান-হাদিস ও ইসলামি আইনের পরিপন্থী হবে না। এরূপ ঘোষণা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে একটা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। কারণ, একদিকে এ উক্তি নির্ভেজাল রূপে সাম্প্রদায়িক। অন্যদিকে অবাস্তব। অবাস্তব, কারণ

ইসলামি আইন—যা ১৭৯২ সাল অবধি এ দেশে প্রচলিত ছিলো তাতে বলে, একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে একজন বিধর্মী সাক্ষ্য দিলে তা গ্রাহ্য হবে না। এই কি তবে বাংলাদেশের ভাবী ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্রের নমুনা? ইসলামি আইন সত্যি সত্যি চালু হলে আধুনিক বিশ্বে এ দেশ কী করে চলবে, তা ভেবে দেখার বস্তু। ব্যাঙ্ক-বীমা বিনিয়োগ-ঋণবর্জিত অর্থনীতি 'ইসলামি ধর্মনিরপেক্ষ' বাংলাদেশের পক্ষে কি এ যুগে খুব একটা মঙ্গলজনক ব্যাপার হবে?

আসলে, বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছেন বটে, দেশের অন্যতম নীতি হবে ধর্মনিরপেক্ষতা, কিন্তু আমাদের কাজে-কর্মে প্রতিনিয়ত আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কার বেরিয়ে পড়ছে। উচ্চকণ্ঠে ধর্মনিরপেক্ষতার ডাক ছেড়েও আমাদের আচারের সেই অসঙ্গতিকে আমরা চাপা দিতে পারছিনে। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মনিরপেক্ষতা এক কঠিন সাধনার বস্তু। রীতি মতো উচ্চ শিক্ষা আর সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়েই সেই উদারতাকে আত্মসাৎ করা সম্ভব। সেটা যেমন সাধনাসাপেক্ষ, তেমনি সময়সাপেক্ষ। ভারতের শাসনতন্ত্র প্রথম থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ, তাই বলে সে দেশের সব মানুষ কিংবা সরকারের সকল স্তর এখনো অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেনি। হয়তো হতে পারে কিন্তু তার জন্যে অন্তত পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে। দ্বিজাতিতত্ত্বের কবরের ওপর বাংলাদেশ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার নিশান উড়িয়েছেন, এটা যেমন সৎসাহসের দৃষ্টান্ত, তেমনি আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রযত্ন ও সাধনার মাধ্যমে জনগণ এবং জনগণের সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন করতে হবে। তবেই এ দেশ সার্থক সেক্যুলার স্টেট বলে পরিচিত ও প্রশংসিত হতে পারবে।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র

ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ
উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

[ভূমিকা : আমি যে বিষয় বেছে নিয়েছিলাম সে হচ্ছে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তার আগে একটা কথা বলে নিতে চাই। যারা একটা ধর্মে বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে ঐ ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক ও অন্যান্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে, নৃ বিজ্ঞানের ভাষায় একটা endogamous unit তৈরী হয়। যেখানেই এই জাতীয় অন্তর্বিবাহমূলক একক গড়ে ওঠে সেখানেই দেখা যায় ধর্ম নিয়ে কলহ হচ্ছে। এটা কিন্তু শুধু ধর্মভিত্তিক কলহ নয়, এটা হচ্ছে দুটো সমাজের দু'রকম প্যাটার্ন। এটা মনে না রাখলে ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রকৃত তাৎপর্যটা আমরা বুঝতে পারব না। আমাদের বুঝতে হবে কেন আকাশবাণী থেকে এখনও শ্যামা সংগীত শুনতে পাই যদিও ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতের পক্ষে এটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ, তার জনসাধারণের একটা অংশ শ্যামা সংগীত শুনতে অভ্যস্ত এবং সেটা ভারতের সংস্কৃতির অঙ্গ। তেমনি আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জন মুসলমান, তাঁরা একটা বিশেষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বিশ্বাস করেন। তাই আমরা যদি রাতারাতি তুড়ি মেরে বলি যে "খোদা হাফেজ" বলা বা কোরান পাঠ থাকবে না তবে সে দৃষ্টিভঙ্গী আর যাই হোক ঐতিহাসিক হবে না।

ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ রাজনীতিক ব্যাপার। ভারত আমাদের সাহায্য করেছে এবং আমরা ভারত থেকে সাহায্য নিয়েছি—সেটাকে রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। এবং এটাও সত্য যে ভারতের সাথে আমাদের একটা ঐতিহাসিক যোগাযোগ আছে এবং সম্প্রীতি আছে—সেটাকেও আমরা অস্বীকার করব না। তবে সবকিছু নিয়ে মাতামাতি করতে হবে এটা নয়।

শেখ সাহেবের অসুস্থতায় আমারা তার জন্য প্রার্থনা করেছি। তার ছবি নিয়ে আমি ডিবেট করছি না, কারো কারো খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু কিছু দিন

আগে 'যুগান্তরে' দেখলাম চব্বিশ পরগণা জেলার বহু মুসলমান বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছেন। কথা হচ্ছে আমরা যে সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ হয়েছি এত সহজে যে তাকে কাটিয়ে উঠতে পারব এমন নয়। সম্প্রদায় আছে বলেই সাম্প্রদায়িকতা আছে। এই সম্প্রদায়ের পেছনেও দীর্ঘ ইতিহাস আ:ছ আমি যে সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মেছি তাকে বাঁচিয়ে রাখবার আমার একটা দায়িত্ব আছে। আমাকে এটুকু বলে নিতে হল।]

বিষয় আভাষ: আমাকে যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সংসদ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়, আমি কয়েকটি ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত দেশের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল এসব দেশের ইতিহাসকে বুঝে দেখতে চেষ্টা করা এবং এদের সাথে তুলনামূলকভাবে বাঙলাদেশের কথা বিচার করে দেখা। বাঙলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আরো আছে। তাই যারা আগে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়েছে তাদের আলোচনা থেকে আমাদের অনেক প্রশ্নের বাস্তব উত্তর লাভ সহজ। সব ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবার মত জ্ঞান আমার নাই। আমি এই প্রবন্ধে আমেরিকা, ফ্রান্স, তুর্কী ও ভারতের কথা আলোচনা করবো ও তারপর কিছু মন্তব্য করব বাঙলাদেশ সম্পর্কে। আমি প্রসঙ্গটি বিচার করে দেখতে চাইব প্রধানত বাস্তব ইতিহাসের পক্ষ থেকে—বিশেষ অধিবিদ্যার (Metaphysics) দৃষ্টি-কোণ থেকে নয়। বাঙলা ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষ কথাটা গ্রহণ করা হয়েছে সেকিউল্যারিজম-এর প্রতিশব্দ হিসাবে। ১৮৪৬ সালের পর থেকে ইংরাজি ভাষায় সেকিউল্যারিজম বলতে অনেক সময় বোঝান হয়ে থাকে জর্জ জ্যাকব হোলিওক (George Jacob Holyowke)-এর মতবাদকে। হোলিওক ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)। তিনি মনে করতেন,

বিধাতা থাকতেও পারেন, নাও পারেন, পরকাল থাকতেও পারে, নাও পারে। এসব নিয়ে তর্ক করা যায়। কিন্তু মাটির পৃথিবী ও তার বুকে মানুষের প্রাণ যাত্রা প্রত্যক্ষ সত্য। তার যথার্থতা সম্পর্কে কোন তর্ক তোলার অবকাশ থাকে না। তার অস্তিত্ব প্রাত্যহিক বাস্তব সত্য। তাই আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই পার্থিব জীবনের কল্যাণ। মানুষের উচিত ঐহিক জীবনে সুখী হবার চেষ্টা করা ও অন্যকে সুখী হতে সাহায্য করা। যদি পরকাল বলে কিছু থাকে তবে মানুষ তার ইহকালে ভাল কাজ করবার জন্য পরকালে পুরস্কৃত হবে। আর পরকাল বলে যদি কোন কিছু না থাকে তবে তাতেও কোন ক্ষতি হবে না। কারণ মানুষ যদি এই জীবনে সুখী হয়, তবে তাই হবে তার পক্ষে এক পরম লাভ। পরকালের প্রতি তাকিয়ে থাকবার জন্য তাকে ইহ জগতের সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হবে না। হোলিওক মনে করতেন, মানুষ যত কারণে অসুখী হয়, তার মধ্যে দারিদ্র্য প্রধান। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কর্মের তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন সমাজ গড়তে সাহায্য করা যেখানে মানুষ তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে না। কেউ গরীব হতে পারবে না। আমি ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদ বলতে হোলিওক-এর বিশেষ মতবাদকে বুঝছি না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে আমি বুঝেছি এমন সব রাষ্ট্রের কথা যাদের ক্ষেত্রে সরকারী ধর্ম বলতে কিছু নেই। আত্মা, পরকাল, ঈশ্বর ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমি কোনো আলোচনায় অবতীর্ণ হব না। কারণ, আমার বক্তব্যকে তুলে ধরবার জন্য এসব বিষয়কে টেনে আনবার কোন প্রয়োজন হবে না।

১। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আমেরিকা :

আমেরিকার সংবিধানে কোন ধর্মকে সরকারী ধর্ম বলে ঘোষণা করা হয় না। বরং বলা হয় ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে থাকতে হবে নিরপেক্ষ। কারণ এই পথেই সম্ভব বিভিন্ন প্রকার খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ

এড়িয়ে যাওয়া। আমেরিকানদের মনে ছিল ইউরোপের ধর্মীয় বিবাদের স্মৃতি। তারা চেয়েছিল, আমেরিকার নতুন মাটিতে এই ধরনের কোন কলহকে টেনে না আনতে। তা ছাড়া আমেরিকা হল প্রজাতন্ত্র। কোন রাজা থাকলো না। থাকল না সামন্তবাদী সমাজ কাঠামো। রাজারা চির কালই বলেছেন, রাজ্য শাসনের ক্ষমতা তাঁরা পেয়েছেন কোন না কোন প্রকার দৈব শক্তির কাছ থেকে। জনসাধারণকে শাসন করবার তাঁদের আছে পবিত্র অধিকার। কিন্তু আমেরিকায় এই অধিকারের দাবী তুলবার কোন কারণ থাকলো না। ঠিক হল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিধাতাকর্তৃক নির্বাচিত হবেন না, বা কোন পবিত্র অধিকার বলে দেশকে পরিচালিতও করবেন না। তিনি হবেন গণনির্বাচিত আর জনগণের সম্মতিই হবে তাঁর শক্তির উৎস।

আমেরিকার সংবিধানে সকল ধর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই স্বাধীনতা কোন চূড়ান্ত অর্থে স্বাধীনতা নয়। আমেরিকার সংবিধানে বলা হয়েছে সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু ধর্মকে জননিরাপত্তার ও সাধারণ নীতি চেতনার পরিপন্থী হওয়া চলবে না। আমেরিকার আইন অনুসারে "Any religious practice that is contrary to public peace or morality may be outlawed, such as snake handling or polygamy"• অর্থাৎ আমেরিকায় ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে যা খুশী তাই করা চলে না।

আমেরিকায় বিভিন্ন মতাবলম্বী খৃষ্টানরা ইউরোপ থেকে গিয়ে বসতি করে ছিল। কিন্তু ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি আমেরিকায় উদ্ভব ঘটে এক নতুন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের। এরা নিজেদের বলে মরমন (Mormon)। মরমনরা বলে,

---

• Bill of Rights দ্রষ্টব্য।

যেহেতু একমাত্র হজরত ইসা ছাড়া আর সব নবী একসাথে একাধিক বিবাহ করেছেন, তাই বহু বিবাহ প্রথা কিছু অন্যায় নয়। বহু বিবাহ সম্পর্কে মরমনদের মতের জন্য আমেরিকায় কথা ওঠে মরমন সম্প্রদায়কে বেআইনী করবার। মরমনরা শেষে তাঁদের বহু বিবাহ সম্পর্কে মতবাদকে পরিত্যাগ করেন। মরমন-রা বলেন বহু বিবাহ তাঁদের একমাত্র বক্তব্য নয়, লক্ষ্যও নয়।

আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে একাধিক মামলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেন্দ্র করে। আমেরিকার সংবিধানের ছয় ধারায় (Article VI) বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয় চাকুরীর যোগ্যতা প্রমাণের জন্য কার কাছ থেকে ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রশ্নের উত্তর চাওয়া চলবে না: "No religious test shall ever be required as qualification to any office or public trust under United States." ১৯৬১ সালে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা আসে। মামলাকারী অভিযোগ করেন যে, আমেরিকার মেরিল্যাণ্ড রাষ্ট্রে সরকারী চাকুরিতে যোগ দেবার সময় বিধাতার নামে শপথ নিতে হয়। এর ফলে যাঁরা কোন ধর্ম মতে বিশ্বাস করেন না এবং মনে করেন, মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য কোন ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন নাই তাঁদের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই প্রথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থী। আদালত মামলাকারীর পক্ষে রায় দেন। ফলে এ ধরনের শপথ নেওয়ার প্রথার অবসান ঘটে।

আমেরিকার অনেক সরকারী স্কুলে আগে ক্লাশ আরম্ভ হবার আগে প্রার্থনা করা হত। ১৯৬২ সালে একজন সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন যে, এ ধরনের প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ মার্কিন সংবিধানের পরিপন্থী। তিনি মামলায় জয়লাভ করেন। ফলে সরকারী স্কুলগুলোতে প্রার্থনা করা ও বাইবেল পাঠ উঠিয়ে দেওয়া হয়।

অর্থাৎ আমেরিকার আদালতের রায় অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ দাঁড়িয়েছে ব্যাপক, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কেবল ধর্ম বিশ্বাসীদের স্বাধীনতা নয়, ধর্মে অবিশ্বাসীদেরও স্বাধীনতা। যদি না, এই স্বাধীনতা জননিরাপত্তার ও সাধারণ নৈতিক বিধির পরিপন্থী হয়।

২। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ফ্রান্স :

ফরাসী বিপ্লবের সময় ফান্সে গ্রীর্জার সমস্ত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া হয় এবং যাজকদের মাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় রাষ্ট্র থেকে। এর ফলে ফ্রান্সের ক্যাথলিক চার্চ হয়ে পড়ে ফরাসী রাষ্ট্রের অধীন, পোপের ক্ষমতা প্রায় লোপ পায়। কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের যোগ ঘুচে যায় না। ক্যাথলিকবাদ ফ্রান্সের সরকারী ধর্ম হয়েই থাকে। ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় ১৯০৫ সালে। ফ্রান্সের র‍্যাডিক্যালদল এ সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ সময় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মরিস রুভিয়ে (Morice Rouvier)। ফরাসী র‍্যাডিক্যালরা ছিলেন ভয়ঙ্কর ভাবে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা করবার পেছনে তাঁদের যুক্তি ছিল : রাষ্ট্রের টাকা ধর্মের পেছনে ব্যয় না করে জনহিতকর কাজে ব্যয় করা উচিত। রাষ্ট্র-কর্তৃক কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের লোককে সমর্থন করার অর্থ অন্যদের রাষ্ট্রীয় সমর্থন থেকে বঞ্চিত করা। তাঁদের আপন মত প্রচারের সমান সুযোগ না দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা। ফরাসী দেশের রাষ্ট্রীক দর্শনের মূল নীতি হচ্ছে তিনটি : সমতা, সখ্যতা ও স্বাধীনতা। এই নীতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হলে রাষ্ট্র কোন একটা বিশেষ ধর্মমতকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারে না, কোন একটি বিশেষ ধর্মমতকে সরকারী ধর্মমত হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না।

ফ্রান্স এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু ক্যাথলিকবাদ ফরাসী জীবনে এখনও গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। তা তার সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে নানাভাবে। অবশ্য বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি পারিবারিক ব্যাপারে রাষ্ট্রিক আইনই এখন কার্যকর, ধর্মীয় আইন নয়।

৩। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তুর্কী :

তুর্কী একসময় ছিল বিশেষভাবেই ধর্মীয় রাষ্ট্র। তুর্কীর সুলতান নিজেকে দাবী করতেন, সারা মুসলীম বিশ্বের খলিফা হিসাবে। ইসলামের রক্ষক হিসাবে। কামাল আতাতুর্ক ১৯২১ সালে ক্ষমতায় আসবার পর তুর্কীকে পরিণত করেন একটি প্রজাতন্ত্রে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে। তুর্কীকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করবার পক্ষে কামাল যুক্তি দেখান যে, তুর্কীকে যদি একটা আধুনিক দেশে পরিণত হতে হয় তবে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকলে চলবে না। আধুনিক জীবনের উপযোগী আইন কানুন রচনা করতে হবে। তাই রাষ্ট্রকে হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ। রাষ্ট্রের আইনকে হতে হবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে—সনাতন ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজনে নয়। কামাল তাঁর এ-সময়কার একটি বক্তৃতায় বলেন : 'যা মরে গেছে, তাকে সুন্দর সিল্কের চাদর জড়িয়ে লাভ নেই—জীবন মানে এগিয়ে চলা। কামালের নীতি সারা মুসলীম বিশ্বের উপর বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সর্বত্র মুসলিম বিশ্বে আধুনিক-মনা অংশ কামালকে স্বাগত করেন, কিন্তু সনাতনপন্থীরা করেন তাঁর নিন্দা। বাঙালী মুসলিম সম্বন্ধেও এর প্রতিক্রিয়া হয়ে ছিল। তুর্কীতে বিবাহ, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন, মেয়েদের স্বাধীনতা ইত্যাদি ব্যাপারে আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করতে পারবার ফলে।

অবশ্য তুর্কীর দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করে গ্রাম্য জীবনে মোল্লা ও ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব বিশেষভাবেই থেকে গিয়েছে। কামালের পর তুরস্কের ক্ষমতা লাভ করেন কামালের সহযোগী ইউমামুর হাতে। এর পর

ক্ষমতা লাভ করেন আদনান মেন্দারেস। মেন্দারেস জনসাধারণের ধর্মীয় চেতনাকে নিজের পক্ষে এনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চান। কিন্তু মেন্দারেস শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হন। তুরস্কের আধুনিক-মনা সংস্কৃতিবান সম্প্রদায় তার উপর হয়ে ওঠেন বিরূপ।

৪। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত :

ভারতের ইতিহাস আমাদের সবার কাছেই বিশেষভাবে পরিচিত। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা শেষ হয় ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর। এই সংবিধানে জনসাধারণকে অনেকগুলি মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি। এবং বলা হয়েছে, রাষ্ট্র হিসাবে ভারত হবে ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকারের সাথে সাথে বলা হয়েছে, এই স্বাধীনতা জননিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিক চেতনার পরিপন্থী হতে পারবে না। আমেরিকার সাথে ভারতের সংবিধানের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে, ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ভারতীয় পার্লা-মেন্টের উপর কোন প্রাধান্য নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইন সভাকর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে বাতিল করতে পারে না। তাই যে কোন বিষয় ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের আইনগত মূল্যকে খুব বেশী বলা যায় না। স্বাধীনতা লাভের পর গত পঁচিশ বছরে ভারত কি পরিমাণ ধর্মনিরপেক্ষ হতে পেরেছে, আমি সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে যাব না। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত। ভারতের রাষ্ট্রিক আইন ধর্মীয় কারণে এখনও সব নাগরিকের জন্য একরকম হতে পারছে না। উদাহরণ, ভারতে উত্তরাধিকার আইন (Succession Act) প্রণয়নে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসৃত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানের জন্য এক আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া বিবাহ ও পরিবার প্রথা সম্পর্কেও এক আইন প্রণয়ন করা যায়নি। ভারতে হিন্দুরা এখন আর বহুবিবাহ করতে পারেন না। কিন্তু মুসলমানরা পারেন।

৫। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে বাঙলাদেশ :

বাঙলাদেশকে, বর্তমান সরকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এই রাষ্ট্রের সংবিধান এখনও রচিত হয়নি। কিছু দিনের মধ্যেই হবে। সংবিধানের কাঠামো ঠিক কি হবে, সে সম্পর্কে আমি কোন জল্পনা করতে পারি না। আমি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নই।

তবে একটা কথা আমার মনে হয়, আমাদের দেশেও সকল ধর্মের স্বাধীনতা কথাটিকে মেনে নেওয়া হবে কতগুলি বিশেষ সর্তে। এ ক্ষেত্রেও থাকবে বিধিনিষেধ। যেমন আছে অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে। বাঙলা-দেশে সরকারী ধর্ম বলে কিছু থাকবে না। ধর্মের স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও দেশের সাধারণ নীতিচেতনার পরিপন্থী হতে পারবে না।

মানুষকে নিয়েই রাষ্ট্র। মানুষের মনোভাবের প্রতিফলনই ঘটে রাষ্ট্রিক আইনের মধ্যে। নীতিচেতনা মানুষের চিরকাল এক থাকেনি। মানুষের এ ব্যাপারে ধারণা বদলেছে। নতুন আইন হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষও তার আপন আশা আকাঙ্খা ও নীতিচেতনাকে কেন্দ্র করেই চলবে। বাঙলাদেশ রাষ্ট্র হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলে নীতিবিহীন হবে, এমন নয়। যেমন হয়নি অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র পর্যালোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছি।

দ্বি তী য় দি নে র আ লো চ না

অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী,
ইংরেজি বিভাগ

স্থান এবং কালের বিভিন্নতাজনিত কারণে 'সেক্যুলরিজম' শব্দটির অর্থ পালটে যায়। এবং যেহেতু বাংলাদেশের ধর্মনিরপেতার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, তার উদ্ভব ও বিকাশ ভিন্নতর—কোন দেশকে সরাসরি অনুকরণ করা এই নীতিটি লালনে সহায়ক নয়। এমন কি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার পটভূমিকা এবং অনুষঙ্গ এক নয়।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সেই ধারাটি পুষ্টিলাভ করেছে যার তাত্ত্বিক জন্মদাতা রাজা রামমোহন রায় এবং যার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীরা।

বাংলাদেশের নবজাগরণ ঘটে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে। এবং এই নবজাগরণ কেবলমাত্র নগর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রভাবিত করেনি—গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষও এর দ্বারা যথেষ্ট আক্রান্ত হয়েছে। এই নবজাগরণ হঠাৎ করে সম্ভব হয়নি, এর জন্য সময় লেগেছে অনেক। এক পর্যায়ে আমরা এক শ্রেণীর মুক্তবুদ্ধির মানুষ পেয়েছি যারা ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন এই গোঁড়ামির অবশিষ্ট অংশকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা নতুন নয়—এর ইতিহাস আমাদের অনেক পিছনে নিয়ে যায়। মোঘল সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুর পরে দারা ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই লড়াইকে ক্ষমতা দখলের লড়াই বলে মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ছিল দুটি ভিন্ন মানসিকতার লড়াই, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার। কারণ, আচার এবং আচরণে ঔরঙ্গজেব ছিলেন পুরোপুরিভাবে সাম্প্রদায়িক এবং দারা ছিলেন তুলনামূলকভাবে উদার এবং ধর্মনিরপেক্ষ। যদিও বর্তমান অর্থে ধর্ম-নিরপেক্ষতার বিকাশ তখনো ঘটেনি। যাই হোক এই যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব জয়ী হন এবং সেই বিজয় ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিজয়। পাকিস্তানের জন্মলাভও সাম্প্রদায়িকতার পরবর্তী বিজয় এবং বাংলাদেশের জন্মলাভ এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয়—যা একটি স্থায়ী বিজয় কিনা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার মূলমন্ত্র সহনশীলতা। এবং যখন সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ হয় তখনই তা সম্ভব হয়। কেবল রাষ্ট্রীয় নীতিতে তার ঘোষণা থাকা নিরর্থক হয়ে পড়ে যদি মানুষ তার চর্চা না করে। ধর্মনিরপেক্ষতাও একটি উদার ধর্ম—যাতে যে-কোন ধর্মাশ্রয়ী বা ধর্মে বিশ্বাসী নন এমন ব্যক্তিও যোগ দিতে পারেন।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব ও বিকাশের কারণ three dimensional—ত্রিবিধ। এর একটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক, অন্য দুটি হচ্ছে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। সাংস্কৃতিক সাযুজ্য, আচার আচরণ, ভাষা-সাহিত্যের একতা – বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে একে অপরের কাছে আসতে সাহায্য করেছে এবং পরস্পরের সম্পর্কে সহানু-ভূতির সৃষ্টি করেছে। সহনশীলতা ও সহাবস্থানের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে।

বাংলাদেশের মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠার আর একটি কারণ রাজনৈতিক। পাকিস্তানের পটভূমিকায় পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। কারণ, পাকিস্তানের মোট জন সংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ লোক ছিলেন বাঙালী মুসলমান। কাজেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভের জন্যে—নির্বাচনে জয় লাভের যা ছিল পূর্ব-শর্ত—দেশের শতকরা দশ ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন থেকেই একটি সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়।

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার লাভের তৃতীয় কারণটি অর্থনৈতিক। ১৯৪৭ এর আগে—এ দেশের শোষক শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এবং শোষিত শ্রেণীর মানুষেরা ছিলেন প্রধানত মুসলমান। কাজেই এই অর্থনৈতিক ব্যবধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানের জন্মের পর কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, শোষণের আসনে বসল পশ্চিম পাকিস্তানীরা—বিশেষ করে পাঞ্জাবী মুসলমান শ্রেণীর দল এবং শোষিত হতে থাকলেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়। কাজেই পরিবর্তিত অবস্থায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আর শোষকের ভূমিকায় অবস্থান করছেন না এবং তাঁরা বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে সমপরিমাণে বঞ্চিত—তখনই পরস্পরের সঙ্গে অবিরোধ ও মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠলো এবং এই অবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার লাভে বিশেষভাবে সহায়ক হলো।

যদিও বাংলাদেশের সরকারের ঘোষিত নীতির প্রধান একটি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা—এ দেশের সব মানুষই যে রাতারাতি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে একথা বলা ঠিক হবে না। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ হবার পথে অনেকগুলি প্রতিবন্ধকতা আছে। প্রথমত সাধারণ মানুষের মধ্যে

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে ধর্মহীনতাকে এক করে ফেলেন এবং আতঙ্কিত হন। এ ছাড়া একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রও—যারা এখনও সাম্প্রদায়িকতার লালনে তৎপর—দেশের মানুষের মধ্যে যাতে শুভবুদ্ধি ও ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব গড়ে না ওঠে তার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। বিগত চব্বিশ বছরে যে আবর্জনা, যে হীনমন্যতা আমাদের মানসিকতায় আশ্রয় এবং বিস্তার লাভ করেছে, হঠাৎ করে তার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্ত আবর্জনা ক্রমশ অপসারিত হবে এবং তা যথেষ্ট সময়- ও প্রচেষ্টা-সাপেক্ষ।

ধর্ম সম্পর্কে আমাদের মধ্যে এমন অনেক মোহ আছে যা প্রধানত অজ্ঞতাপ্রসূত। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতাও এই মোহ বিস্তারের জন্য সহায়ক। মুক্তবুদ্ধির পরিচ্ছন্ন আলোকে আমরা যদি ধর্মের অধ্যয়ন করি—ধর্ম সম্পর্কে আমাদের সব রকম বিভ্রান্তি কেটে যেতে পারে এবং একটি অস্বাস্থ্যকর মানসিকতার হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। কাজেই কেবল ধর্মের সঙ্গে বিযুক্তিতেই নয়, পরিচ্ছন্ন ধর্ম চর্চার মাধ্যমেও ধর্মনিরপেক্ষতায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হতে পারে।

অধ্যাপক ফজলুল মোবিন চৌধুরী
সমাজতত্ত্ব বিভাগ :

বাংলাদেশকে যখন ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয় তখন কেউ ভুলে যাননি যে, এদেশের শতকরা আশিজন নাগরিকই মুসলমান। কাজেই ড. সামাদ যখন শতকরা হিসাব তুলে মুসলমান বলে বিশেষ জোর দিতে

চান তখন তিনি কি 'ইসলামিক রিপাবলিকে'র কথা ভাবেন? তিনিও বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা চান এবং ধর্মনিরপেক্ষতা মানে রাষ্ট্রকে ধর্ম পরিচয়ে পরিচিত না করা। আমাদের অনেক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত নেতাও সুবিধা মতন বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলে বর্ণনা দিয়ে মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন লাভ করার চেষ্টা করছেন। এটাও একই জাতীয় স্ববিরোধিতা। মুসলিম রাষ্ট্র আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এক নয়।

আমাদের সরকার অন্যথায় বারবার ঘোষণা করছেন বাঙালী জাতীয়তাবাদ আমাদের মূলনীতি—অর্থাৎ আমরা বাঙালী এটাই আমাদের পরিচয়। আমরা শুধুমাত্র বাঙলাদেশীয় নই। এই পরিচয়েই ধর্মনির-পেক্ষতার প্রকাশ। এই পরিচয় আজকে ১৯৭৪ সনে গঠনতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল বলেই আমরা হঠাৎ বাঙালী ব'নে যাইনি। আমরা আবহমানকাল ধরেই বাঙালী ছিলাম। আমাদের ধর্ম পরিচয় হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ. এ ছাড়াও আমাদের বাঙালী বলেও একটা পরিচয় ছিল—বাঙালী সংস্কৃতি বলেও একটা বিশেষ বিচিত্রমুখী সংস্কৃতিও চলে আসছে। এবং এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা সম্বন্ধে আমরা অচেতনও ছিলাম না। তাই ধর্মের নামে, রাষ্ট্রের ঐক্যের দোহাই দিয়ে যখন পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির চেষ্টা করেছিলেন তখন বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম ঐক্যের চাইতে বাঙালী হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির ঐক্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। এ দেশে এই ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে গ্রামে বরাবরই ছিল। তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নে ধর্ম পরিচয়কে এক সময় বড় বলে মনে হয়েছিল। কারণ এটার পেছনে প্ররোচনাও ছিল। এটা বোধ হয় একেবারে তাৎপর্যহীন নয় যে হিন্দু-মুসলমান কয়েকশ বছর পাশাপাশি বাস করার পর বৃটিশ শাসকদেরকে

এদেশ থেকে তাড়ানোর আন্দোলন যেই জোরেসোরে শুরু হল অমনি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উপর্যুপরি হতে লাগলো। ধর্মভিত্তিতে যে সমস্ত ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান দুটো পরিষ্কার জাতিতে বিভক্ত এ তত্ত্ব জিন্নাহ্ সাহেব দিলেন মাত্র তিরিশ বছর আগে। তবু এই তত্ত্ব যে তখন আমরা বাংলাদেশের মুসলমান এবং অন্যান্য মুসলমানেরা গ্রহণ করে ছিলাম তা-ও মিথ্যে নয়। কিন্তু এ গ্রহণের পেছনেও সামাজিক কারণ ছিল এবং অর্থনৈতিক কারণও ছিল। রাজনীতির খেলায় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও তিক্ততা দু'পক্ষ থেকেই উস্কানো হয়েছিল। অথচ বাঙালী নেতাদের মধ্যেই অনেকে যাঁরা এককালে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন তাঁরা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যও নির্যাতন সহ্য করেছেন ও কেউ কেউ চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেছেন। পাকিস্তান আমলে বাঙলা ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রথম বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয়টা রাজনীতিতে প্রাধান্য পেয়েছিল। বাঙালী মুসলমান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল।

তবে ধর্ম পরিচয়টা সবার জন্যই কি একেবারে গৌণ হয়ে গেছে? আমরা কি সত্যি-সত্যি একেবারে নিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে পড়েছি? হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শুরুর সময় থেকে—তার মানে পঞ্চাশ ষাট বছরের উপরে—যে সন্দেহ ও বিদ্বেষ নিত্য প্রচার দ্বারা জাগিয়ে রাখা হচ্ছিল তা কি উবে গেল? তার প্রতিক্রিয়া কি ধুয়ে মুছে গেছে? স্বাধীনতা সংগ্রাম চলা কালে কি সব চেয়ে খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানো হয়নি? তবু এই রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বাঙালী সাম্প্রদায়িক ঐক্যও সবচেয়ে বেশী জোর পেয়েছে।

রাষ্ট্র অবশ্য যদি মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করেই তার দায়িত্ব শেষ হল তবে ভুল হবে। রাষ্ট্রীয় কার্যবিধিতে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে,

রাজনীতিকদের আবরণে যদি আমরা পুরানো অভ্যাসে মুসলমানী স্টাইল বজায় রাখতে থাকি তা সে ব্যক্তিগত অসতর্কতার জন্যই হোক আর মধ্য প্রাচ্যের মনোরঞ্জনের জন্যই হোক, তবে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যাহত হবে, লোক বিভ্রান্ত হবে। আমি জানি, আমরা রাতারাতি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যেতে পারি না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাও যত্নে লালন করার ব্যাপার, সচেতন অনুশীলনের ব্যাপার। ব্যক্তিরও বিশেষ করে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও এই ব্যাপারে দায়িত্ব সরকারের চেয়ে কম নয়।

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী,
ইংরেজি বিভাগ ঃ

বাংলাদেশে গত পঁচিশ বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের উন্মেষের সুন্দর বর্ণনা মুরশিদ সাহেব দিয়েছেন। তবে তাঁর ক্ষোভ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য যে, অতীতের অভ্যাস রাতারাতি যায় না এবং কতগুলো নীতি ঘোষণা করলেই যে সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সে নীতির অনুস্মৃতি দেখতে পাবো এটাও আশা করা যায় না। তবে মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটে। এ ব্যাপারে সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।

এ কথাটাও ভুললে চলবে না যে, পরোক্ষভাবে অনেক শক্তি কাজ করে—সে জন্যে নতুন রাষ্ট্রে আমাদের সাবধানতার প্রয়োজন আছে। সত্যকার গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বা গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালী মুসলমান সবদিক থেকে কোণঠাসা ছিল। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদের কাছে বাঙলী পরিচয়ের

চাইতে মুসলমান পরিচয়টাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং সেটা তখনকার সমাজও সেই ভাবেই গ্রহণ করে নিয়েছিল। আমার ছেলেবেলায়ও বাঙালী Vs মুসলমান ফুটবল খেলা হতে দেখেছি। এই সমস্যা তখন ছিল এবং তার বিশ্লেষণ চলতে পারে—তবে আজ আমাদের যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শ তাতে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান প্রভৃতি পরিচয় গৌণ হয়ে যাওয়া উচিত। বিলীন হয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করি। তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রে অনেক চিত্র, অনেক বক্তৃতা, অনেক সংবাদ আমরা লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে মুরশিদ সাহেব পুরোনো ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রকাশ দেখেছেন। কিন্তু এ এক ধরনের ব্যক্তিপূজারও প্রকাশ। গণতান্ত্রিক সমাজে কোন মানুষ কোন নেতাকে যদি অতিমানুষ বলে মনে করা হয়, তবে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। নেতাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, গণতান্ত্রিক সমাজে নেতা হিসেবেই সম্মান করব। Hero-worship এবং গণতন্ত্রের ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা মুশকিল। হিরো-ওয়রশিপ বা বীরপূজার মধ্য থেকে ফ্যাসিজমের উদ্ভব হতে পারে। নেতাকে অতিমানুষের স্থানে বসালে তার কার্য কলাপ তার কথা বার্তা সব কিছু সমালোচনার উর্ধ্বে বলে কারো কারো মনে হতে পারে। এটা কাম্য নয়। নিরাসক্ত বিচারের প্রয়োজন আছে।

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে ধর্ম তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে না। যেটা আমরা চাইব সে হল শিক্ষার মধ্য দিয়ে এমন মনোভাব গড়ে তোলা যে জীবনে ধর্মের প্রকৃত মূল্য বা প্রকৃত স্থান আমরা দিতে পারি। যাতে ব্যক্তিগত জীবনে আমার ধর্ম পালন করলেও সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে, অন্য ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে একটি সহিষ্ণুতার ও শ্রদ্ধার মনোভাব বজায় রাখতে পারি। এটা যদি হয় তা হলে একই সমাজে বিভিন্ন ধর্ম

সম্প্রদায়ের উপস্থিতি কিংবা কেউ ধর্মে বিশ্বাস করল, কিছু লোক করল না, কিছু লোক সন্দেহবাদী থাকল, কিছু লোক ধর্মে উদাসীন রইল – যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজে এই অবস্থা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আমাদের সমাজেও অবশ্যই এরকম একটা পরিস্থিতি থাকতে পারে। তা হলে যিনি ধার্মিক—তিনি, যিনি নাস্তিক তাকেও শ্রদ্ধা করতে পারবেন, সম্মান করতে পারবেন, যদি সেই নাস্তিক ব্যক্তিটি অন্য দিক থেকে সম্মান বা শ্রদ্ধার পাত্র হন। এবং নাস্তিক ব্যক্তিটিও কিংবা যিনি অজ্ঞেয়বাদী তিনিও – যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে ধার্মিক তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবেন না।

অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা
অর্থনীতি বিভাগ :

রেডিওতে শ্যামা সংগীত কি গজল প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দিয়ে ড. সামাদের যুক্তি বিস্তার মূলত অন্তঃসারশূন্য এবং বস্তা-পচা অতি পরিচিত cliche। এই শ্যামা সংগীত ও গজল প্রভৃতি সামগ্রিকভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে প্রবহমান। আমি যদিও ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম মানিনে, তবু আমি চাইব, ঈদ আমারও উৎসব—ঈদের আনন্দ অনুষ্ঠানে আমারও ডাক পড়ুক, এ সংস্কৃতিতে আমিও অংশ নিই। যেখানে মানুষের জীবনে ধর্ম আছে সেখানে ধর্মকে ভিত্তি করে তার যে কার্যাবলী এবং তারই ওপর ভিত্তি করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তাকে অস্বীকার করাটা চোখ বুঁজে থাকার সামিল। সে ক্ষেত্রে এটা আছে কি নেই—এই নিয়ে কাল্পনিক প্রতিপক্ষ

খাড়া করে তর্ক কার উদ্দেশ্যে? আমরা সকলেই চাই, যে-সংস্কৃতি প্রবহমান, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে, সমৃদ্ধ করতে এবং প্রসারিত করতে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা এটাও চাই যে, সংস্কার থেকে আমাদের মুক্তি ঘটুক।

ডক্টর আসগর আলী তালুকদার
বাণিজ্য বিভাগ :

এ যাবৎ কালের আলোচনা থেকে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের মোক্ষ লাভ ঘটেনি এবং আমাদের মধ্যে এখনও ধর্মান্ধতাও আছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ সহজ নয়। কেউ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলছেন। কেউ উদাসীন থাকতে বলছেন। ড. সামাদ আমেরিকার শাসনতন্ত্রেরও উপরে সুপ্রীম কোর্টের সর্বময় ক্ষমতার উল্লেখ করেছেন। আমাদের এই আইনগত, শাসনগত, শিক্ষাগত, মনোভাবগত সামাজিক জীবন—সরকারী প্রচার প্রভৃতি সবকটি কথাই মনে রাখতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের prescription-এর ব্যাপারে আরেকটু Specificভাবে আলোকপাত প্রয়োজন।

নূরুল আমীন মজনু :

জনাব গোলাম মুরশিদ সাহেবের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েও আমার ভয় হয় তাঁর বক্তব্য আমাদের জনগণের মানসিকতা থেকে অনেক দূরে—বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ড. সামাদ তাঁর ভূমিকায় ইতিহাসের দোহাই

পেড়ে যে ইঙ্গিত করেছেন তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। ইতিহাস সব সময় প্রগতির পথে চলে না। গতি মানেই প্রগতি নয়। ইতিহাসে অনেক ভুলের উদাহরণ আছে তার থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব। সেই ভুলগুলিকেই নতুন করে ভুল করার স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে গ্রহন করব না। সামাদ সাহেবের প্রবন্ধের শেষে আতাতুর্কের উদ্ধৃতি আছে ঃ 'জীবন মানেই এগিয়ে চলা।' সামাদ সাহেব তাঁর ভূমিকায় কিন্তু পিছিয়ে পড়ার পরামর্শই দিয়েছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষে আন্দোলন আসলে সমাজে যে শ্রেণী সংগ্রাম চলছে, সেই শ্রেণী সত্যের আবরণ উন্মোচনেরই আন্দোলন। এটা একটা Ideological warfare। শ্রেণী যুদ্ধের তিনটি দিক থাকে। অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বা ideological। অধ্যাপক অসিত বাবু আলোচনায় এই তিনটি দিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। শ্রেণী সচেতনতা শ্রেণী সংগ্রামের অন্য নাম। এই সচেতনতাকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য, কুয়াশাচ্ছন্ন করার জন্য, অনুভূতিকে ভোঁতা করার জন্য ধর্মকে ও বিভিন্ন মতবাদকে ব্যবহার করা হয়। যাঁরা সুবিধাভোগী তাঁরা এটা করেন। শোষিতকে প্রলেপ দেয়া হয়। আপাতভাবে শোষিতের সঙ্গে শোষকের সম্পর্ককে ধর্ম ইত্যাদি দ্বারা ভাল দেখানোর চেষ্টা করা হয়। এই আবরণ উন্মোচন করতে হবে।

কিন্তু জনগণের মানসিকতা ইচ্ছামাত্র বদলায় না। তার অতীতের কিছু টান থাকে। এ ব্যাপারে বাস্তব বোধ প্রয়োজন এবং প্রয়োজন অতীতের পর্যালোচনা। গত ন মাসের সাম্প্রদায়িকতার পরোক্ষ প্রকাশের নানা বিব্রতকর অভিজ্ঞতার পেছনেও এই অতীত সক্রিয়। ভারতে যে আজও সাম্প্রদায়িকতা রয়ে গেল তারও কারণ এই অতীত। তবে ইচ্ছাকৃত উস্কানিও আছে। মনে রাখতে হবে যে, শ্রেণী শোষণকে ঢাকা দেয়ার জন্যই এগুলি দরকার, এগুলি করা হয়ে থাকে।

ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশেও ধর্মীয় উস্কানি সম্ভবপর। যেমন কম্যুনিজমের নামেই কম্যুনিজমে বিভেদ সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমাজতন্ত্রের নামেই প্রতিহত করা হয়। লাল ঝাণ্ডাকে লাল ঝাণ্ডার নামেই নামানো হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে যেন তা না হয়। কারণ, সে চেষ্টার লক্ষণ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই দেখছি।

অধ্যাপক আলী আনোয়ার,
ইংরেজি বিভাগ:

ডক্টর সামাদ সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলেছেন। যাঁরা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন বা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা কেউই তাঁদের বক্তব্যে সম্প্রদায়ের মৃত্যু কামনা করেছেন এমন দেখি না। সম্ভবত তবে সম্প্রদায় নয়, তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যু কামনা করেছেন। সম্প্রদায় আর সাম্প্রদায়িকতা এক কথা নয়। ধর্ম রেখেও ধর্মীয় সংঘাত এড়ানো যেতে পারে, সম্প্রদায় রেখেও সাম্প্রদায়িকতা এড়ানো যেতে পারে।

তা ছাড়া সম্প্রদায়েরও ইতিহাস উৎপত্তি ও বিবর্তন আছে। আজকে আমেরিকার বা ইউরোপের খ্রীষ্টান আর মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত খ্রীষ্টান ত আর এক নয়। সমাজ ও সংস্কৃতিরও তেমনি বিবর্তন আছে ও নানা উপাদান আছে। আজকের নগরকেন্দ্রিক যন্ত্রসভ্যতা আর মধ্যযুগের সংস্কৃতি তো এক নয়। আজকের সম্প্রদায়কে তাই আজকের সভ্যতায় উপযোগী হয়ে বাঁচতে হবে—মধ্যযুগীয় মানসিকতা তাকে আজকের সমস্যা মোকাবেলা করায় সাহায্য করবে না। কাগজে মোনাজাতের ছবি

সম্বন্ধে মুরশিদ সাহেব সম্ভবত যেটা বলতে চেয়েছেন যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ও বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রার্থনা করে থাকবেন, তাঁরাও বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসেন এবং বঙ্গবন্ধুর অসুস্থতায় উৎকণ্ঠিত হন। সে সমস্ত প্রার্থনা সভার দু'চারটি ছবি অন্তত সরকার-নিয়ন্ত্রিত কাগজগুলিতে থাকলে ধর্মনিরপেক্ষতার দিক থেকে সেটি শোভন হতো।

অধ্যাপক আবদুল খালেক,
বাংলা বিভাগ :

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আশাবাদী। গণচীনে প্রবাসকালে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাকে আশাবাদী করেছে। গণচীন সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং সেখানে সাম্প্রদায়িকতা নেই, এ সম্বন্ধে সবাই একমত। কিন্তু আমি দেখেছি যে, সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যারা মুসলমান তাদের জন্য সরকারী খরচে মসজিদ ও মসজিদের ইমাম রাখা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা প্রায় আঠার বছর ধরে চলেছে। ১৯৫৪ সনে সেখানে প্রচুর সরকারী অর্থব্যয়ে ইসলামিক অ্যাকাডেমীও করা হয়েছে। তার সঙ্গে একটা মিউজিয়ামও আছে। সরকারী খরচে চীনা মুসলমানরা হজ্ব করতেও যেতেন। অবশ্য ১৯৬৬-র পর অবস্থা বদলেছে। চীনা সরকার দীর্ঘ সময় নিয়েছেন এই বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মানসিক পরিবর্তন করায়। চীনকে এমন কি রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের পরিপন্থী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে হয়তো অনিচ্ছাক্রমে, কিন্তু সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়েছে।

কাজেই জনসাধারণের অনুভূতিকে রূঢ়ভাবে আঘাত করে রাতারাতি ধর্মনিরপেক্ষ করা যাবে কিনা, আমার সন্দেহ আছে। পরিবর্তন ধীরে

ধীরে আসছে। কিছু দিন আগেও আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম সেমিনার করতে পারতাম না। স্বাধীনতার আগে, মাত্র কয়েক মাস আগেও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার স্বপক্ষে প্রচার চালানো হয়েছে, এত শীগ্‌গির তা সব মুছে যায়নি। আমাদের সময় নিতে হবে। হয়তো গণচীনের মত আমাদের মধ্যেও ধীর কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

আমরা সব রকম শিক্ষাকেই গ্রহণ করব। ধর্মশিক্ষাও এক রকম শিক্ষা। ধর্মকে যেন সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করি। আমি তাই আশাবাদী।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ঃ

আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা আগেই ছিল তার পরিচয় আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা প্রভৃতির সময়ে বিশেষ করে দেখেছি। সেই বিপদের সময় হিন্দু-মুসলমান, আল্লা ও হরি সহায় করে একে অন্যকে দেখে আসছেন। পঁচিশে মার্চের দুর্যোগেও এর পরিচয় আমরা পেয়েছি। এপারে এবং ওপারে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে জায়গা দিয়েছে। ভবিষ্যতে যদি আমরা শিক্ষিত পণ্ডিতরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষতার ওপরে সেমিনার না করে ঐ সমস্ত দুর্যোগে ও বিপদে হিন্দু-মুসলমান গ্রামবাসীকে ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে সাহায্যের জন্য, রক্ষার জন্য এগিয়ে আসি, তবে আর এই আলোচনা সভার দরকারই হবে না—লোক আপনা থেকেই ধর্ম-নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠ্‌বে এবং উৎপাদক হয়ে উঠ্‌বে। এই জাতীয় সেমিনারেব আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

যে দেশের নিরানব্বই জন অধিবাসী ধর্মের অন্ধকারে নিমজ্জিত সেখানে এই সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চত্বরে সীমাবদ্ধ না রেখে গঞ্জে-বন্দরে-গ্রামে নিয়ে যাওয়া উচিত।

মাদ্রাসা শিক্ষা অথবা হিন্দুদের যে ধর্মীয় শিক্ষা আছে সেটাকে তুলে দিলেই ধর্মনিরপেক্ষতা হবে না। অথবা হঠাৎ করে রাতারাতি যদি ধর্মকে উঠিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে উৎপাদক করে ফেলতে চান তবে উৎপাদন তো হবেই না বরং বন্ধ হয়ে যাবে। আয়ুব-মোনায়েম-টিক্কা আমলের গোঁড়া মোল্লা-পুরুতদের ধর্ম প্রচারের মত ধর্মনিরপেক্ষতারও গোঁড়ামী হতে পারে।

প্রশান্তকুমার চক্রবর্তী :

সকল ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয় কল্যাণ তাহলে বাংলাদেশে আচরিত হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুশীলন দ্বারাও সামগ্রিক মঙ্গল সম্ভব হবে। এর যে কোন একটি যদি ব্যাহত হয় ততটুকুই সামগ্রিক কল্যাণ বা উৎকর্ষ ব্যাহত হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন এইখানেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন আমরা বিভিন্ন বিভাগে মারামারি না করে সব জ্ঞানেরই চর্চা করি, সমাজেও তেমনি সব ধর্মেরই চর্চা করব মারামারি না করেই।

মোহাম্মদ ইউনুস আলী :

ভারতের সমাজ জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকাশ সম্বন্ধে মুরশিদ সাহেব আলোচনা করেননি। ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তা-বাদে সাম্প্রদায়িকতা হবে না এ কি বলা যায়?

আবদুর রহমান সরকার ঃ

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা অতীতে হয়েছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু পরস্পরের প্রতি সহনশীলতাও ছিল এটাই আজ জোর দিতে হবে। বাঙালী এবং মুসলমান এই জাতীয় হাস্যকর ভাগা-ভাগি যেমন এককালে ছিল তেমনি এটাও সত্য যে দাঙ্গার সময় অতীতে অনেকে নিজের জীবন বিপন্ন করেও অন্য সম্প্রদায়ের লোককে রক্ষা করেছেন। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাজনৈতিক ঠিকই কিন্তু ভারত-বিরোধী প্রচার যে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে পর্যবসিত হয় এটাও ভুললে চলবে না। এটা গত বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ও আমরা দেখেছি।

নূরুল ইসলাম ঃ

শুনতে পাই বাংলাদেশের বিহারী মুসলমানরা অনেকে খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এরাই কিছুদিন আগেও ইসলামের জন্য জান কোরবান করে ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামের নামে অনেক ব্যভিচারও করেছেন। ধর্মবিশ্বাসও তাহলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে বদলায়। বৌদ্ধরা একসময় অনেকে হিন্দু হয়ে গেছেন বা দলে দলে মুসলমান হয়ে গেছেন। কিন্তু এজাতীয় ধর্মান্তর অতীব দুঃখজনক। সেক্যুলরিজম এই জন্যই দরকার। কারণ, সেক্যুলরিজম শুধু ধর্মনিরপেক্ষ-তাই না, সম্প্রদায় নিরপেক্ষতাও বটে।

মোস্তফা কামাল :

অধ্যাপক সাহা নিজেই ধর্মে বিশ্বাস করেন না অতএব তিনি তো ধর্মনিরপেক্ষতা চাইবেনই। বাংলাদেশ ভারতের চাইতে ধর্মনিরপেক্ষ, কারণ এখানে ধর্মীয় দলগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'আমরা কাউকে অনুকরণ করব না'—বলেছেন অধ্যাপক অসিত রায় চোধুরী। কিন্তু গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের মত ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রেও আমাদের কাউকে না কাউকে অনুকরণ করতে হবে।

তপন রুদ্র :

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বা সমন্বয় শুধু নয় জনকল্যাণ চিন্তার উন্মেষই ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্দেশ্য। তার জন্য প্রকৃত গণচেতনার উত্তরণ চাই। সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি আসবে যুক্তিবাদের পথে। সব ধর্মেই সংস্কার দ্বারা তাকে সময়োপযোগী করে নেয়া হয়েছে। পরিবর্তনকেও বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিতে হবে। তা না হলে কল্যাণ করা যাবে না।

সৈয়দ আবদুল মান্নান :

ধর্ম মানুষের আজন্ম সাথী, একে বাদ দিয়ে মানুষ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। ধর্মীয় ভাবাপন্ন মানুষ যদি ধর্মীয় অনুশীলন চায় তবে মাদ্রাসা শিক্ষা থাকবে। তবে হাঁ, মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন। মাদ্রাসা

গুলো অত্যন্ত গোঁড়া ও সেকেলে থেকে গেছে। এর আধুনিকীকরণের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ সত্য কিন্তু দেশের প্রধান-মন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ নন। তিনি মুসলমান; তিনি কি ভুলে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্ বলা? তিনি মারা গেলে তাঁর কি জানাজা হবে না? অথবা তিনি কোন ধর্মনিরপেক্ষ স্বর্গে যাবেন?

মজহার হোসেন :

ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে ধর্ম ও ধর্মহীনতার মধ্য-পথ। রাম ও রহিমের সহাবস্থান। খানিকটা ধর্ম দু-পক্ষকেই ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ গোঁজামিল। গোঁজামিল চলতে পারে না।

ডক্টর এবনে গোলাম সামাদের প্রত্যুত্তর :

আমার বক্তব্য নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি একথা বলতে চাইনি যে আমি ধর্মনিরপেক্ষতা চাই না। আমি একথাই মনে করিতে দিতে চেয়েছিলাম যে, সব কিছুকেই দেখতে হবে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে।

আমার এক ছাত্রবন্ধু শ্রেণী-সংগ্রাম ও অন্যান্য কথা বলেছেন, মার্কসবাদের কথাও উঠেছে। মার্কস বলেছেন, প্রত্যেক ঘটনাকে ইতি-হাসের আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। সমাজকে যদি বদলাতে হয় ইতিহাসকে বুঝেই বদলাতে হবে। ইতিহাসকে না বুঝে নয়। আমাদের

দেশে যে আজ ধর্ম-নিরপেক্ষতার কথাটা উঠেছে তার থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে আমাদের দেশে একটা বাস্তবতা আছে যেটাকে বদলাতে হবে ?

আমার ছোট বেলায় গান শুনেছি "রাম রহিম না যুদা করো ভাই, দিলকো সাচ্চা রাখো জী"। কিন্তু দিলকে সাচ্চা রাখা যায়নি। ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেছে। বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যাবে না। পাকিস্তান ভেঙে গেছে সত্য কিন্তু এক ভারত তো আর হয়ে যায়নি ?

কেউ কেউ বলেন যে বস্তাপচা বুলি আওড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এত সত্যি যে বস্তাপচা আবর্জনা দুর্গন্ধ ছড়ায়। কাজেই জানতে হবে কি করে এই আবর্জনা সরাতে হবে। আবর্জনা থেকে দূরে সরে নয়। ধর্ম জিনিসটা অত্যন্ত জটিল। ইতিহাসকেও অতি-সরলীকরণ করা যায় না। ধর্ম-নিরপেক্ষ আমেরিকার কথা বলেছি। আমেরিকা সত্যি ধর্ম-নিরপেক্ষ কিন্তু তার ইতিহাসে কেনেডি-ই একমাত্র ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট এবং তিনিও খুন হয়েছেন। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও ধর্মের একটা প্রভাব থাকে। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট পার্টি একটা বিরাট শক্তি। ইউরোপে ধর্মের প্রভাব কি চলে গেছে ? ব্যাকুনিন বলেছিলেন : 'Religion is collective madness'। তিনি সমস্ত রাশিয়াকে রাতারাতি বদলাতে চেয়েছিলেন তাঁর অ্যানারকিজমের মাধ্যমে, সেটা কার্যকরী হয়নি। বরঞ্চ এটাই বলতে হবে যে, ধর্মনৈতিকতার মধ্য দিয়ে যে মানসিকতার প্রকাশ পায় সেটাকে বুঝে তবে বদলাতে হবে। না হলে বদলানো যাবে না। আমরা যেন ঐতিহাসিক মনোভাবের পরিচয় দেই, তা না হলে সমস্ত জিনিসটাই তালগোল পাকিয়ে যাবে।

নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। কারণ বয়স আমার অনেক হলো। 'রামেশ্বর দিবসে' দেখলাম হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে চলেছে কলকাতার রাস্তায়, 'রশীদ আলী দিবসে' দেখলাম হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে চলেছে কলকাতার রাস্তায়। তারপরে দেখলাম হিন্দু-মুসলমান ভাগ হয়ে গেল, দেশ ভাগ হয়ে গেল। অনেক কিছু দেখেছি জীবনে, তাই জন্য আমরা ভয় পাই। এ ভয় ইতিহাসের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। যারা এসব জানে না, তারা হয় তো অন্য কিছু বলতে পারে। যাদের একটু বেশী বয়েস তারা এসব ভাবতে চায়, ভেবে চিন্তে কাজ করা ভাল।

অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের প্রত্যুত্তর :

বিতর্ক এতটা প্রলম্বিত হত না যদি আমরা বক্তব্যটাকে ঠিকমত বুঝতাম। আমার বক্তব্য ছিল, ধর্ম আমার ব্যক্তিজীবনে থাকবে। বন্ধুবন্ধুর জন্য প্রার্থনা আমি একশবার করব। রাষ্ট্রীয় জীবনে সেটাকে টেনে আনব না। আমার ধর্মবিশ্বাস আমারই ধর্ম বিশ্বাস। সামাজিকজীবনে ও পাল-পার্বণের মধ্যে সেটা যেন স্থান পায়, কিন্তু রাষ্ট্রের জীবনে সেটা টেনে আনা উচিত হবে না। আমি ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা এই বুঝি।

এমন কথা আমি কোথাও বলিনি যে, ধর্ম আমরা পালন করব না অথবা কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে হবে। সনৎ বাবুর প্রবন্ধে ধর্ম-নিরপেক্ষতার একটা উদাহরণ আছে। তিনি বলেছেন যে, যদিও তিনি নিজে ধর্মে বিশ্বাস করেন না, তবু যে কোনো সম্প্রদায়ের অত্যন্ত ধার্মিক লোক, তাঁর বন্ধু বা আপনজন হতে কোনো বাধা নেই।

সাহিত্য সংসদ আয়োজিত এ আলোচনা সভার আমন্ত্রণপত্রে খোলা আহ্বান ছিল যে, যে কেউ এ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। আমরা সকলের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। তাই এ আলোচনা খোলা রাখা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে তাই।

সমাজে সম্প্রদায় আছে, থাকবে—বলেছেন ড. সামাদ। সেটা ঠিক, আমরা নানা সম্প্রদায়-বিভক্ত পৃথিবীতে বাস করছি আবার রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাস করব। তার মানে সম্প্রদায়গত পরিচয় মুছে ফেলা নয়, তাকে রাজনৈতিক প্রাধান্য না দেওয়া।

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ শিক্ষা নিতে হবে। সে শিক্ষা ধর্ম সম্বন্ধে হতে পারে। ধর্ম সম্বন্ধে যদি আমরা প্রকৃতভাবে জানি—তার উৎপত্তি তার ইতিহাস—তবে বিশ্বাস বজায় রেখেও মোহমুক্ত মন নিয়ে আমরা ধর্মালোচনা করতে পারব। লাঠালাঠি হবে না। এই মোহমুক্তি ঘটলেই আমরা rational ও সহনশীল হব। তাকেই বলি ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব।

অনেকে ধরেই নিয়েছেন যে, কারো অসুস্থতায় প্রার্থনা করার আমি বিরোধী। আমার উপস্থাপনার দোষে এরকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। কারো অসুস্থতায় প্রার্থনা, মোনাজাত করায় ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যাহত হয় না। আমরা একশবার নামাজ পড়তে পারি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। আমি বলেছিলাম, রাষ্ট্রীয় জীবনে যদি শুধু একটি মাত্র সম্প্রদায়ের প্রার্থনাই বড় করে স্থান পেতে থাকে তাহলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বস্তি পায় না এবং ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শ সে আদর্শ থেকে রাষ্ট্র বিচ্যুত হয়।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা না হলে কি সাম্প্রদায়িকতা থাকবেই ?—এই প্রশ্ন করেছেন জনৈক ছাত্রবন্ধু। এমন কথা আমি বলিনি। পৃথিবীতে সবগুলো জাতীয়তা ভাষাভিত্তিক নয় এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা হলেই যে আমরা সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হবো এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমার যেটা বক্তব্য ছিল, সেটা হল, আমরা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলাম, এখন আমরা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী হওয়ার ফলে খানিকটা অসাম্প্রদায়িক হয়েছি।

একই ছাত্রবন্ধু ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমার মন্তব্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি প্রবন্ধেই বলেছিঃ যদিও ভারতের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করা হয়েছে তবু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেখানকার জনগণ বা সরকার পুরোপুরি সেক্যুলার হতে পারেননি।

প্রধানমন্ত্রী কি ইনশাআল্লাহ বলবেন না ? এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। মুসলমান হিসেবে নিশ্চয়ই বলবেন। আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম যে, প্রধান-মন্ত্রী হিসেবে যখন তিনি সমস্ত সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে ভাষণ দিচ্ছেন বা একটা Public Statement দিচ্ছেন তখন বারবার এই জাতীয় ধর্মীয় অনুষঙ্গযুক্ত শব্দ ব্যবহার এড়াতে পারলেই ভাল। আমি কখনো বলিনি যে, প্রধানমন্ত্রী বলে তাঁকে ধর্মহীন হতে হবে বা সমাজ থেকে ধর্ম তুলে দিতে হবে।

সভাপতির ভাষণ :

প্রফেসর সালাহ উদ্দীন আহমদ
ইতিহাস বিভাগ।

আজকের অধিবেশনের সাফল্যের একটা প্রমাণ এই যে, আমরা সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে এখানে আলোচনা করেছি ও শুনেছি।

আজকের অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসুস্থতার সময় যে প্রার্থনার আয়োজন করা হয় তা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন ও প্রশ্ন তুলেছেন। এবং আলোচনার পৌনঃপুনিকতা থেকে যেটা বোঝাই যাচ্ছে যে, এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। অসুস্থতায় প্রার্থনা করার সঙ্গে বা Public prayer-এর সঙ্গে ধর্ম-নিরপেক্ষতার কোন বিরোধ আছে বলে আমি মনে করি না। সব সম্প্রদায়ই নিজ নিজ বিশ্বাস ও রীতি অনুযায়ী প্রিয়জনের জন্য, সেই প্রিয়জন রাষ্ট্রনায়কও হতে পারেন,—তার জন্য প্রার্থনা বা মোনাজাত প্রভৃতি করতে পারেন এবং করবেন। ধর্মনিরপেক্ষতা তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না।

আমার মনে এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে বা সরকারী উদ্যোগে যদি এই জাতীয় কোন Public prayer-এর আয়োজন করা হয় যাতে সরকার চান যে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়েরই লোক যোগদান করুক তবে আমরা কি এমন কোনও রীতি গ্রহণ করার কথা ভাবতে পারি না যাতে সব ধর্মসম্প্রদায়ই সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে? আমরা অনেক সময় শোক সভায় যেমন কিছু সময় সকলে নীরবে দাঁড়িয়ে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি ও বিগত আত্মার জন্য

প্রার্থনা করি। এই জাতীয় কোন রীতি সরকারীভাবে অনুমোদিত হলে হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই পাশাপাশি বসে একই প্রার্থনা সভায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করতে হবে। সেটা সহনশীলতার একটা প্রকাশ। তেমনি সামাজিক জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনেও সহনশীলতার চর্চা করতে হবে। বাংলাদেশে এই সহনশীলতা আবহমান কাল ধরে ছিল একথা এখানে অনেকেই বলেছেন। ধর্মান্ধতাও ছিল না এটা বলা ভুল হবে। —তবে বাঙালী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই সহনশীলতা ও সমন্বয়কে প্রাধান্য দেওয়ায়। পাকিস্তানী আমলের প্রচণ্ড ধর্মীয় প্রচারের সময়ও আমরা দেখেছি একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ মনোভাব এদেশে ছিল এবং তৎকালীন বহু বুদ্ধিজীবীর লেখায় এর নির্ভীক প্রকাশ আমরা দেখেছি। আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'পূর্ব-মেঘ' এই দিক থেকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

পাকিস্তানী চিন্তাধারার অনেকাংশই ছিল মধ্যযুগীয়, অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক। সাবেক পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্ম তাই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। যে অংশ এখন পাকিস্তান সেই ভূখণ্ডেও এখন নানা রকম কলহ ও সংঘাত দেখতে পাচ্ছি। এসব কলহ বা দ্বন্দ্ব আর ইসলামকে নিয়ে নয় এবং ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার কথাও পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের মুখে আর শুনতে পাচ্ছি না। অথচ একই রাষ্ট্রনায়করা কিছুদিন আগেও ইসলামের নামে, ইসলামী রাষ্ট্রের জিগীর তুলে বাংলাদেশকে শোষণ করায় আগ্রহী ছিলেন।

মানুষ ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল। তাই ধর্ম বিপন্ন এই কথা বলে তার বিচার শক্তিকে বিচলিত করা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন

এঁকে ব্যবহার করা যায়, অর্থনৈতিক শোষণকে লুকোনোর জন্যও একে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশকে তাই আজ ধর্ম-নিরপেক্ষ হতে হয়েছে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই ধর্মকে যাতে আমরা টেনে না আনি। তবেই বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

তৃতীয় অধিবেশন

বিষয় : ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ

সভাপতি : ডক্টর মফিজউদ্দীন আহমদ

প্রবন্ধ পাঠ : অধ্যাপক আলী আনোয়ার

আলোচনা : অধ্যাপক হাসিবুল হোসেন, অধ্যাপক চৌধুরী জুলফিকার মতিন, অধ্যাপক ফররুখ খলীল, অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, জিয়াউল ইসলাম হিলালী, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ, কাজী গোলাম মোস্তফা ও আরো অনেকে।

ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক আলী আনোয়ার
ইংরেজি বিভাগ

আমরা আজকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছি ইউরোপে যার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে তিনশ বছর আগে। ক্যাথলিক আর লুথেরানদের মধ্যে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ধরলে চারশ বছর। ফ্রান্সে হিউজেনট ও ক্যাথলিক জনসমষ্টির মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ধর্মীয় সহনশীলতাকে আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করতে হয় Edict of Nantes-এর ঘোষণায় ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে। বেলজিয়ামে প্রটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে সন্ধির ঘোষণাপত্র ১৬০১ সনে। বিলেতে পিউরিটানরা গণবিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের শাসনতন্ত্রে নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে নেয়—যদিও ক্যাথলিকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রকৃতভাবে ফিরে এসেছে দ্বিতীয় চার্লসের ঔদার্যের ঘোষণায় ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে, যাকে বলি Declaration of Indulgence। ইউরোপ থেকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার নির্যাতনজনিত কারণে বিতাড়িত অসংখ্য প্রটেস্টান্ট উপদলীয় জনসমষ্টি যাঁরা আমেরিকাতে চলে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় পত্তনের গোড়া থেকেই তাঁরা ধর্মীয় সহনশীলতা ও নিরপেক্ষতাকে সমাজনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপে ধর্মীয় নির্যাতনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁদেরকে এই সহশীলতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ইতিহাস পর্যালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি যে তথ্যটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই তা হল এই যে,

ধর্মনিরপেক্ষতার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনেই ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাস্তিক্যবাদী প্ররোচনা বা সমাজের গুটিকয় বুদ্ধিজীবীর ধর্মহীনতার প্রলোভন থেকে সেক্যুলরিজমের উদ্ভব হয়নি। বাংলাদেশেও ধর্মনিরপেক্ষতা একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত এবং রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র হিসেবে অধিষ্ঠান। সমাজে মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ধর্মাবলম্বী লোক থাকতে পারে, একই ধর্মের বিভিন্ন উপদল থাকতে পারে, বিভিন্ন মতাদর্শ থাকতে পারে—এই বিচিত্র জনসমষ্টিকে তাদের গোষ্ঠীপরিচয়কে বিঘ্নিত না করে একটি সাধারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যে নিয়োজিত করার প্রয়োজন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব।

কিন্তু সেক্যুলরিজম শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ধর্মীয় আদর্শ ছাড়াও সমাজে নানা মতাদর্শ থাকতে পারে। সকল আদর্শই বিশেষ ধরনের জ্ঞানের ওপর সংস্থিত। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় সহনশীলতা অতিক্রম করে যায় এবং জ্ঞানের জগতেও এই নিরপেক্ষতা প্রসারিত হয়। জ্ঞানকেও ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্তি দিতে হয়। হল্যাণ্ডে হিউ গ্রোটিয়াস যখন ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে আইন সংক্রান্ত চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন তখন ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের এই আদর্শই তাঁকে উদ্বোধিত করে। এবং সেক্যুলরিজমের ধারণা পরিপূর্ণতা পায়।

সেক্যুলরিজমের লক্ষ্য তা হলে শুধুমাত্র ধর্মীয় নিরপেক্ষতাতেই অর্জিত হয় না, বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তি এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা,— তথা Non-conformist ব্যক্তির মুক্তিকেও দাবী করে। সামাজিক পরিবেশ এই সেক্যুলরিজমের সাফল্যের জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি তার অন্যতম পরিপূরক বিদ্যালয় বা জ্ঞানপীঠগুলিতে খোলা হাওয়া। সামাজিক পরিচালনা (সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) ও ব্যক্তির চিন্তা পদ্ধতি সেক্যুলরিজমের

দুই প্রস্থানভূমি বা পীঠস্থান। ব্যক্তিকে তো তার চিন্তার বা অনুভবের স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দেয়া যায়। নিজের শুভাশুভ নির্ধারণ করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু সমাজের শুভাশুভকে নির্ধারণ করবে কে এবং কি উপায়ে? এই সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রশ্নেই আমরা নিরপেক্ষতা-কেন্দ্রিক অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও দাহ্য বিতর্কে প্রবেশ করছি।

কোন একটি ধর্মীয় অনুশাসন কি এই দায়িত্ব পালন করতে পারে না? গলদ কি কোন কোন ধর্মের সত্যাসত্যে? কোন একটি ধর্মকে চূড়ান্ত বা মহত্তম সত্য বলে মেনে নিয়ে কি সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নির্দেশাবলী পাওয়া যাবে না?

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মমত যে অবস্থায় আছে এবং আড়াইশো কোটি জনসমষ্টি যেভাবে বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান, সংখ্যাগত বিচারে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ধর্মে বিভক্ত হয়ে আছে কখনো তাদেরকে কোন একটি ধর্মমতে ধর্মান্তরিত করা যাবে কিনা সে সমস্ত সমস্যার ব্যবহারিক (Practical) দিক নিয়ে আমি আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি তত্ত্বগত সমস্যাবলীর দিকে সাময়িকভাবে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হলে সমাজে ধর্মের ভূমিকা কি তা দেখতে হয়। আমি যতটুকু বুঝি সমাজে ধর্মের ভূমিকা দ্বিবিধ; এক, জীবনের অর্থ উন্মোচন করা; দুই, সামাজিক জীবনের জন্য নির্দেশাবলী চয়ন করা। অর্থ উন্মোচন দ্বারা আমি ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার অভিজ্ঞতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, তাৎপর্য আরোপ করা; সৃষ্টি ও স্রষ্টা, মৃত্যু ও অমরত্ব প্রভৃতি দুর্জ্ঞেয় আবেগসঞ্জাত প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছি। ধর্মের এই দিকটি ব্যক্তিমানুষ ও তার চেতনাকে কেন্দ্র করে

দানা বাঁধে। ধর্মের দ্বিতীয় দিকটি তার সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক। ধর্মের নৈতিক নির্দেশাবলী এই দুটি দিকের মধ্যে Mediate করে বা সংযোগের কাজ করে। এক স্তরে জ্ঞান বা অনুভব অভ্যন্তরে নৈতিক নির্দেশাবলীতে রূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয় দিকটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মই কোন না কোন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকটি ধর্মের সামাজিক অনুশাসন বিশ্লেষণ করলে আমরা ঐ ধর্মের উৎপত্তির সামাজিক পরিবেশটিকে সনাক্ত করতে পারি। কোন ধর্মে বহুবিবাহের প্রশ্রয় যেমন সমাজে বহুবিবাহের প্রথা চালু থাকলেই হতে পারে। সুদ গ্রহণ করা বা না করা সংক্রান্ত অনুশাসন সমাজে সুদ গ্রহণ করার সুফল বা কুফল জনিত অভিজ্ঞতা থেকেই আসতে পারে। তাই Tribal, Feudal, বা Nomadic পরিবেশে যে সমস্ত ধর্মের উদয় হয়েছে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা ঐ সমস্ত ধর্মের সামাজিক অনুশাসনের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই ; সামাজিক কাঠামো বদলে গিয়েছে। পুরনো সমস্যা হয়ত নেই, নতুন সমস্যা এসেছে তার জা'গায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন সমস্যাত হয়েইছে, আবার পুরনো সমস্যাও থেকে গেছে। কাজেই পুরনো সামাজিক অনুশাসনগুলি কালচিহ্নিত ও অচল হয়ে পড়তে পারে। চোর চুরি করলেই হাত কেটে দেই না আমরা। পর্দাশাসিত মুসলিম সমাজের আধুনিক যুব সম্প্রদায় রোমান্টিক প্রেমের জন্য কি উন্মুখ নন ? যদিও ছবি তোলা নিষেধ কিন্তু গোপনে রক্ষিত তাঁর প্রিয়তমার ছবিটি Star Studio তে তোলা। ধর্মীয় অনুমতি মোতাবেক Polygamy তে বিশ্বাস করেন শুনলে কিন্তু প্রিয়তমার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি ঘটতে পারে! এটা ধরেই নেয়া যায়। আবার অনেক অনুশাসন অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে কার্যকর হয় না— সামাজিক প্রবণতা বা প্রয়োজনের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য।

সুদ গ্রহণ সংক্রান্ত অনুশাসন ধরা যাক। ইসলাম ও খৃষ্টান দুই ধর্মেই সুদ গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল—কুসীদজীবীদের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য এমনকি খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে অর্থাৎ ইসলাম প্রচারেরও এক হাজার বছর আগে—গ্রীক আইন Lex Genucia তে সুদ গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এ্যারিস্টটল সুদ গ্রহণকে অন্যায় এবং প্রাকৃতিক আইনের (Natural Law) বিরোধী বলে যুক্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সুদ গ্রহণ বন্ধ করা যায়নি। পাঠানরা তাঁদের ধর্মপ্রাণতার জন্য প্রসিদ্ধ; কিন্তু মুসলিম ধর্মপ্রাণ পাঠানরাই এই মহাদেশে কুসীদজীবী হিসেবেও বিখ্যাত—তাঁদের বৃত্তি তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে বিরোধ সৃষ্টি করেনি। সমস্ত মধ্যযুগ ধরে চার্চের 'পুলপিট' বা মেহরাব থেকে সুদ গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছে। ফলে সুদের ব্যবসায় ইউরোপে খৃষ্টানদের হাত থেকে ইহুদিদের হাতে চলে গিয়েছিল। যদিচ মোজেইক কোডে (হজরত মুসার আইনে) ইহুদিদেরকেও সুদ নিতে নিষেধ করা হয়েছিল (Levit cus XXV. 36 ও Deuteronomy XXIV. 20.),* অথচ যুদ্ধ বিগ্রহ বা অন্যান্য প্রয়োজনে যখন চার্চ বা রাজন্যবর্গের টাকা ধার নেয়ার প্রয়োজন হল তখন Poena Conventionalis, Damnum Emergens, Lucrum Cessans, Montes Pietatis প্রভৃতি আইনের রন্ধ্র পথে সুদকে পরোক্ষ প্রশ্রয় দিতে হয়েছে। পুঁজিবাদী বিকাশের প্রয়োজনে যখন প্রচণ্ড পরিমাণ লগ্নির প্রয়োজন হল তখন বেন্থামের মতো দার্শনিককে ১৭৮৭ সনে লিখতে হল Defence of Usury। ১৮৫৪ সনে বিলেতে সুদ গ্রহণের ওপর আইনগত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হল। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, প্রুসিয়া প্রভৃতি দেশেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই। ধর্মীয় অনুশাসন আবদ্ধ হয়ে রইল শাস্ত্রের পাতার মধ্যে।

* 'If your brother becomes poor, you are responsible to help him. . . don't charge him interest on the money you lend him.' ইত্যাদি।

অনেক ধর্মীয় অনুশাসন আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক বা সাম্প্রতিক মনে হয়। মনে হয় হয়ত সেই সমস্ত অনুশাসন থেকে ভবিষ্যতের নির্দেশ পাওয়া যাবে। যথা যিশুখৃষ্ট বলেছেন, 'The poor shall inherit the earth'। যিশুখৃষ্টের বাণী তৎকালীন দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের মধ্যে আশার বাণী এনেছিল। তারা দলে দলে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নে। মনে পড়ে বৌদ্ধ ধর্মেও হিন্দু বর্ণ প্রথার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্লিষ্ট জনসাধারণকে সমতার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। অথচ হিন্দু ধর্মেও ত দরিদ্রকে নারায়ণ বা ভগবানতুল্য মনে করে সেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আজকাল অনেকেই ইসলামিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন এবং ইসলামিক সমাজতন্ত্রই একমাত্র খাঁটি সমাজতন্ত্র এরকমও আমরা শুনতে পাচ্ছি। মওদুদি যদিও দুবছর আগে—অর্থাৎ নির্বাচনের আগে, বলেছিলেন ইসলাম ও স্যোসালিজমে কোন মিল নেই বরং বিরোধ আছে। খৃষ্টানধর্মের সমাজতান্ত্রিক প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়ে আলবিগেনসিস, লোলার্ড, লেভেলার, কাথারী, এ্যানাব্যাপটিস্ট প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় সামাজিক স্বপ্ন দেখে গেছে এবং সামাজিক আন্দোলন করে গেছে। জার্মানীর মুলহাউসেন ও মুনস্টারে ১৫২৫ ও ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে এ্যানাব্যাপ-টিস্টরা বামপন্থী কম্যুনিস্ট স্টাইলে গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে বিলেতে ডিগার্‌রা (Diggers : চাষ করে যারা) উইন-স্টানলীর নেতৃত্বে সারে অঞ্চলে জমি দখল করে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক জনপদের পত্তন করেছিলেন। প্যারাগুয়েতে যেস্যুইট সম্প্রদায়ের খৃষ্টানরা ১৬০২ থেকে ১৭৬৭ পর্যন্ত দীর্ঘ দেড়শ বৎসরাধিক কাল সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁদের জনপদ চালানোর চেষ্টা করেছে। খৃষ্টীয় সাম্যবাদের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেক লণ্ডনের রাস্তায় অষ্টাদশ শতকের শেষে শ্রমিক মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাস্টিল অবরোধের স্টাইলে আক্রমণ করেছেন নিউগেট কারাগার। বাস্টিল অবরোধে এরই পুনরাবৃত্তি

দেখি ন বছর পরে। ইত্যাকার অজস্র উদাহরণ দেয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে ইসরায়েলে ইহুদিদের 'কিব্যুত্‌জ' চৈনিক কম্যুনের ইহুদী রূপান্তর মাত্র। অথচ ইহুদী র‍্যাবাই, রোমান ক্যাথলিক পোপ বা ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ প্রত্যেকেই মওদুদীর মত বলবেন না-কি যে তাঁদের ধর্মের সঙ্গে সোস্যালিজমের বিরোধ অত্যন্ত মৌলিক? শুধু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেই নয় একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক নির্দেশ ও লক্ষ্য নিয়ে নানা বিরোধী সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়ে পড়ি আমরা। নির্দেশ গ্রহণ করবো তা হলে কার হাত থেকে? এবং কোন নির্দেশ? বস্তুতপক্ষে এ সমস্ত নির্দেশ তাই এখন আমরা গ্রহণ করি অর্থনীতি শাস্ত্র থেকে বা সমাজতত্ত্ব থেকে বা রাজনীতিতত্ত্ব থেকে এবং সেটা সামাজিক প্রয়োজনেরই তাগিদে। সমাজতন্ত্রকে যখন রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করি তখন ধর্মীয় বিতর্কের মধ্যে পথ না হারিয়ে ফেলার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকেই গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্র কারোরই ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানতে চায় না।

ধর্ম থেকে কি তবে সামাজিক অনুশাসনটুকু বাদ দিয়ে নেয়া যায় না? সত্যিই কি যায়? কে বাদ দেবে—আপনি, আমি না মৌলানা বা পুরোহিতরা? আপনি বাদ দিতে চাইলেই কি সেটা আমি মেনে নিতে বাধ্য? আসলে ধর্মের সামাজিক অনুশাসনের দিকটা তার জ্ঞানের দিক বা পরমার্থের দিক বা ব্যক্তিচৈতন্যের দিক থেকে বোধহয় আলাদা করা যায় না। দুটো পরস্পর নির্ভরশীল। ধর্মের অর্ধেক অনুশাসন পালন করে আমি দাবী করতে পারি কি আমি সৎ বা সাচ্চা মুসলমান বা খৃষ্টান? অথচ এটাও ত সত্য যে কোন ধর্মের অর্ধেকটা ভুল হলে পুরোটা সত্য হতে পারে না। এইভাবে সত্য এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

সামূহিক মতবাদের (Total ideology) এটাই হচ্ছে বিপদ—Pakage deal এর মত। প্রায় সমস্ত ধর্মই এই Total ideology ; মার্কসবাদ এ জাতীয় একটি Total ideology। এর অংশ বিশেষের ভুল তাই এত বিপজ্জনক কারণ অংশ বিশেষের ভুল সমগ্র সমাজে সঞ্চারিত হয়ে দূরপ্রসারী অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্ম দিতে পারে। অথচ অংশ বিশেষকে ছাঁটাই করে সমগ্রের আবেদনও টিঁকিয়ে রাখা যায় না।

আবার শুধু ব্যক্তিগত পরমার্থের কথাই ভাবুন। এত সহস্র ধর্মের মধ্যে কোন জাতীয় আত্মিক মুক্তি (Salvation) বা উৎকর্ষে বা বোধিতে আপনাকে আহ্বান করব ? আমাদের সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবহেলিত প্রায় অজ্ঞাত উপজাতীয় আদিবাসীরা আছেন। তাঁরা একেবারে ধর্ম-বিরহিত নন, তাঁদের নিজস্ব ধর্ম আছে—পূজা আচ্চা, পালপার্বণ আছে। খৃষ্টান পাদরীরা তাঁদের ধর্মান্তরিত করে ফেলছে এরকম খবর নিয়ে মাঝে মাঝে খবরের কাগজে উত্তেজনার সঞ্চার হয়। খৃষ্টান ধর্ম কি আত্যন্তিক ভাবে তাঁদের নিজস্ব ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ? কে এই শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করল, কি দিয়ে শ্রেষ্ঠতা নিরূপিত হয় ? তবে কি তাঁদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা যেত না ? অথবা বৌদ্ধ ধর্মে ? আম্বেদকরের সহস্রাধিক হরিজন শিষ্য ভারতে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন বছর বিশেক আগে। সত্যতা বা উৎকর্ষ কি এই জাতীয় ধর্মান্তরকরণের প্রেরণা ? কিন্তু তার চেয়ে বিব্রতকর প্রশ্ন হল কোন বৌদ্ধধর্মে এদের ধর্মান্তর হল—হীনযান অথবা মহাযানে, কোন তস্য উপদলে। একমাত্র ইন্দোনেশিয়াতেই আটত্রিশটি বৌদ্ধ উপদল বা সেক্ট আছে। খৃষ্টান ধর্মের কোন উপ-সম্প্রদায়ের পরমার্থের আকর্ষণ এদের সামনে দেয়া হবে ? রোমান ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাট, ক্যালভিনিস্ট, গ্রীক অর্থডক্স, প্রেসবিটে-রীয়ান, সেভেনৃথ্ ডে এ্যাডভেন্টিস্ট, মোরমন, কোয়েকার ইত্যাকার আরো কয়েকশ উপসম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কোন সম্প্রদায়ের আত্মিক মুক্তির

আদর্শ এদের সামনে তুলে ধরবেন? ইসলামেও তো দল উপদলের শেষ নেই। শিয়া ও সুন্নি দুটি সম্প্রদায় চিরকালই মারামারি করে এসেছে পরস্পরের সঙ্গে। সুন্নিদের মধ্যে চারটে মজহাব—হানাফি, শাফি, মালিকী ও হাম্বলী। শুধু আত্মিক মুক্তির পথ নির্দেশেই নয়, সামাজিক অনুশাসনেও এরা ভিন্ন পথের দিশারী। সুন্নিদের মধ্যে এই চারটে ভাগের বাইরে রইলেন আহলে উবরাই উয়াল কিয়াস, গায়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদিস, ও ওহাবীরা। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে আছেন জাইদীয়, কাইসিনীয়, ইসনা আশারীয় এবং ইসমাইলীয়রা। ইসনা আশারীয়দের মধ্যে উসুলী সম্প্রদায় যুক্তিতে বিশ্বাসী এবং Transcendentalist। আকবরীরা পুরোহিত ও পীর শ্রেণীর মধ্যস্থতায়ই একমাত্র মুক্তি সম্ভব বলে মনে করেন। ইসমাইলীয়দের মধ্যে আছেন এ্যারিস্টটলপন্থী আবদুল্লাহ বিন মাইমুনের অনুসারীবৃন্দ, হামাদান সম্প্রদায় যাঁরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন, হাসিমিন সম্প্রদায় এবং কায়েমেথীয়ামরা। এ ছাড়াও আছেন কাদেরীয়রা, বাতেন সম্প্রদায়, মুতাজিলীয় এবং শিয়া দলভুক্ত জায়েদ বিন জয়নালের মত মুক্তবুদ্ধির অনুসারীরা। আরো আছেন ক্যালভিনিস্টদের সঙ্গে তুলনীয় জা'র পন্থী সম্প্রদায়ের জহম বিন সাফওয়ানের অনুসারীরা। এ ছাড়া সুফী সম্প্রদায়ও আছেনই যাঁদের প্রত্যেকেই এক একটি সম্প্রদায় এবং যাঁদেরকে আল মাতারাদি, আল তাহাউই, আল বাকিল্লানী ও আল গাজ্জালী প্রভৃতি গোঁড়া সনাতনপন্থীরা সব সময়েই সন্দেহ এবং সতর্কতার চোখে দেখেছেন। এ সমস্ত সম্প্রদায় কি সব সময় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান করেছেন? ইসলামের ইতিহাস এর উল্টো কথাই বলে। মুক্তির পথ বেছে নেয়ার উপায় কি? এমন কি ব্যক্তিগত মুক্তির?

ধর্মীয় পরিমণ্ডলে কি মুক্তবুদ্ধির চর্চা হয় না? সমস্ত ধর্মেই ঐতিহ্য, যুক্তিবিদ্যা, বিবেক, প্রথা, লোকশাস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইসলামেও ইসতিহ সান (opinion, জনমত) ইসতিসলাহ (public

expediency), ইজতিহাদ (Legal Conclusion), ইজমা (Consensus), আকল (যুক্তি বা মুক্তবুদ্ধি), নকল (Revelation) প্রভৃতি নিয়ে তর্ক হয়েছে। মুক্তবুদ্ধির অনুসারী মুতাজিলীয়রা নিজেদেরকে 'আহলুত তওয়াহীদ ওয়াল আদল.' অর্থাৎ 'ঐক্য এবং ন্যায়ের অনুসারী' বলে ঘোষণা করেছিলেন। বাতেনীয়রা কোরানকে রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবধর্মেই শেষে গোঁড়া সনাতনপন্থী একজন গাজ্জালী বা টমাস একোয়াইনাস বা শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়। এবং আমরা শুরুতে ফিরে আসি। ওয়াহাবী—আজারিকাদের হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দেশছাড়া করেন, মনসুর হাল্লাজ বা জায়েদ বিন জয়নাল ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যাত হন, মুতাজিলাদের সমস্ত গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং তাঁদের শূলে দেয়া হয়। ইবনে সিনা কারারুদ্ধ হন ও পরে দেশ ত্যাগ করে তাঁকে প্রাণ রক্ষা করতে হয়। ইবনে রুশদ প্রবীণ বয়সে চাকরী ছেড়ে ছুঁড়ে প্রাণ রক্ষা করেন। ইসমাইলীয়রা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলামূত থেকে পালিয়ে আধুনিক আহলে হাদিস আন্দোলনের একজন প্রধান প্রবক্তা পণ্ডিত মীর আবদুল্লাহ গজনভী তাঁর মাতৃভূমি আফগানিস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বৃটিশ ভারতে আশ্রয় পান। এ দিকে ভারতীয় মুসলমান আলেমরা পর্যায়ক্রমে স্যার সৈয়দ আহমদকে তাঁর যুক্তি-প্রবণ ইসলাম ব্যাখ্যার জন্য 'নেচারী' বা প্রকৃতিবাদী, ধর্মীয় পুনর্গঠনের প্রবক্তা ইকবাল, সাম্যবাদী নজরুল, যুক্তিবাদী আবুল হাসেম প্রভৃতি প্রতিভাবানকে ধর্মদ্রোহী কাফের আখ্যা দিয়ে চলেন। ধর্মীয় আলোচনা সনাতনত্বে প্রত্যাবর্তন করে। সব ধর্মসংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। ১৮৬২ সনে পোপ ষোড়শ গ্রেগরী ঘোষণা করেন বিবেকের স্বাধীনতা দেওয়ার মানে হল ভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার স্বাধীনতা দেয়া। সামাজিক পরিবেশ আবার অত্যন্ত বেখাপ্পা হয়ে উঠলে ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিমার্জনার দাবী এখানে সেখানে উচ্চারিত হতে থাকে। ধর্মের দোলক রক্ষণশীল বিন্দু থেকে নতুন ব্যাখ্যার দিকে

দোল খেতে থাকে। কিন্তু দোলক আবার ফিরেও আসে। আরো কিছু সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। নতুন ধর্মও কিছু চালু হয়: আহলল হক বা বাহাই ধর্ম যেমন। মত পার্থক্য তখন মত সংঘর্ষের রূপ নেয়; — কখনো কখনো প্রভূত রক্তপাত ঘটে। প্যারিসে 'St. Bartholomew's massacre-এর মত উনিশশ আটচল্লিশ সনে লাহোরে মওদুদী সমর্থকদের হাতে তিন হাজার কাদিয়ানী নিহত হন। বিচারে মওদুদীর প্রাণদণ্ড হয়। শেষকালে গভর্ণর জেনারেল তার প্রাণ ভিক্ষা দেন। আধুনিক মিশরে মুসলিম ধর্ম চিন্তার অগ্রনায়ক তাহা হোসেন ধর্মবিরোধী বলে আখ্যাত হন। করাচীর ইসলামিক এ্যাকাডেমীর ডিরেক্টর ফজলুর রহমান ক্রুদ্ধ সনাতনপন্থীদের দ্বারা প্রহৃত হন এবং চাকরী ছেড়ে, দেশত্যাগ করেন। তাঁর গ্রন্থ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এটা ধর্মনির্বিশেষে সত্য। মধ্যযুগের ইউরোপেই শুধু ধর্মীয় কারণে হাজার হাজার লোক মরেনি, আজো মরছে।

ধর্মীয় পুনর্গঠনের প্রশ্নটি সেই জন্মেই অত্যন্ত বিপদ্‌জনক হয়ে পড়ে। কারণ ধর্ম মাত্রেই সামূহিক structure of meaning। শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত পুনর্গঠনের নামে সেই কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে গেলে ধর্মপ্রাণ লোক মাত্রেই ঐ সনাতন বিশ্বাস—আশ্রিত নিরাপত্তা থেকে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতাকেও একই কারণে সে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে।

কিংকর্তব্য! ধর্মকে তাহলে তার আপন মনে থাকতে দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? সামাজিক সংহতি, গোষ্ঠিচেতনা ও আত্মপরিচয়ের যে দায়িত্ব আবহমান কাল ধরে ধর্ম পালন করেছে তা এখন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান, ফুটবল ক্লাব, গ্রাম সংস্থা, যুব পরিষদ, ছাত্র সংগঠন, মহিলা প্রতিষ্ঠান, নগর কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘ প্রভৃতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে।

ধর্মও এখন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মতই আরো একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র, তবে অনেক বেশী বড় এবং অত্যন্ত প্রাচীন। কিন্তু নবীন প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিও আমাদের অনুরাগ কম নয় এবং ঐ সমস্ত রাজনৈতিক দল বা সাংস্কৃতিক রীতিনীতিতে আমাদের আবেগ কম গ্রথিত নয়। আমাদের আত্মপরিচয়ে এখন এরাও উৎসাহী অংশ নিচ্ছে। এই বিবর্তন ইউরোপে তিনশ বছর ধরে ঘটেছে, আমাদের এখানে ঘটছে হয়তো পঞ্চাশ বছর কি একশ বছর ধরে।

ধর্ম তার সামূহিক চরিত্র ছাড়েনি। কিন্তু কার্যত তার সামাজিক দিক এবং আত্মিক দিকের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। ইউরোপের চার্চ এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে এটা সূচিত হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগে জ্ঞানের প্রসার বাকীটা সম্পাদন করেছে। অর্থনীতি বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কর্মকাণ্ড এখন আর ধর্মীয় অনুশাসনের মানদণ্ডে বিচার করা হয় না, তার নিজেরই নানা আইনকানুন ও তত্ত্বের ভিত্তিতে তার মূল্যায়ন হয়। সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উদ্দেশ্যে সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, পরিবেশ বিজ্ঞান (Ecology), নগর বিজ্ঞান, স্থাপত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি শাস্ত্রের তত্ত্বাবলীকে উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা এ সমস্তের মধ্যে সামূহিকতার ভয় নেই। অংশের মধ্যে গলদ দেখা দিলে তত্ত্ব ও প্রয়োগ দুয়েকেই পাল্টে নেয়ার সুযোগ আছে সমূহকে ধ্বংস না করেও। এ সমস্ত নব্য প্রয়োগের কোন কোন দিক হয়ত ক্রাইস্ট বা কনফুসিয়াস, বেদ বা বুদ্ধে আগেই সংকেতিত হয়েছিল। কিন্তু পার্থক্য এইখানে যে সমস্ত তত্ত্ব কোন ঐশী সমর্থন পুষ্টতার জন্য গৃহীত হয়নি। সামাজিক উপযোগিতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতেই এ সমস্ত তত্ত্বের প্রয়োগ চলেছে। যত বড় ধুরন্ধর প্রতিভাই হন না কেন মার্কস বা ম্যাকলুহান, লাস্কি বা লুকাচ. পিঁয়াজে বা পেরেটো এই সামাজিক প্রয়োগমানতা ও সাফল্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে যাঁরা আবেগপ্রবণ তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু এমন কি পাশ্চাত্যেও জ্ঞানের এই ধর্মনিরপেক্ষ প্রয়োগেই কি লোকের তৃপ্তি হচ্ছে? সামাজিক বা রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয়টুকুই অনেকের জন্য অস্তিত্বের সমস্ত তাৎপর্য বহন করে না। ধর্মের ক্ষুধা কি সব সময়েই নেই?

এই ক্ষুধা দ্বারা যদি আবেগগত প্রয়োজনের কথা বা আবেগগত আশ্রয়ের কথা বোঝানো হয়ে থাকে তবে বলব যে, হ্যাঁ আছে। কিন্তু এটা বোঝা দরকার। এই আবেগগত আশ্রয়ের সন্ধান আসলে অর্থের ক্ষুধা, মানুষের সর্বগ্রাসী Hunger for meaning। পণ্ডিত প্রবর ফ্রাঙ্কেলের মতে জৈবিক ক্ষুধার মত অর্থের ক্ষুধাও মানুষকে তাড়িত করে নিয়ে চলে। সমস্ত বিশ্বচরাচরকে একটি সামগ্রিক অর্থের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলার আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত ধর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্ম দীর্ঘকাল ধরে মানুষের এই অর্থের ক্ষুধা বা আবেগ নিবৃত্ত করে এসেছে। ধর্মের ইতিহাসে যে এত বিবর্তন, এত বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব বা একই ধর্মের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এত উপদলের সৃষ্টি তারও পেছনে এই অর্থের ক্ষুধা সক্রিয়। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থা বা জ্ঞানের জগতে পরিবর্তনের কারণে যখন প্রাচীন কোন তত্ত্ববিশ্বাস লোককে আর তৃপ্ত করতে পারে না, যখন ঐ ধর্ম বা কোন বিশেষ ধর্মীয় তত্ত্ব আর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মেলে না তখনই নতুন ধর্ম পত্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং একজন ধর্ম প্রবর্তক আবির্ভূত হন। নতুন অর্থের বিন্যাসে বিশ্বচরাচরের ব্যাখ্যা রচিত হয়; মানুষ আশ্বস্ত হয়। নতুন ধর্ম বা উপধর্ম মানুষের আবেগের আনুগত্য লাভ করে। প্লেটো প্রোটাগোরাস থেকে মানুষের সমস্ত দর্শন চিন্তা, সাহিত্য বা বিজ্ঞানে অভিনিবেশও একই hunger for meaning দ্বারা প্ররোচিত। একই অন্বেষার বিভিন্নমুখী প্রবাহ। তবে জ্ঞানের এই বিচিত্র অন্বেষা ও প্রয়োগ সকল মানুষের আবেগকে তৃপ্ত করে না। ধর্ম যে সামাজিক অর্থ বিন্যাসের

কারণে ব্যাপক আবেগগত আশ্রয়ের আশ্বাস রচনা করে ; বিভিন্ন বিষয়ে খণ্ডিত বিশেষজ্ঞের জ্ঞান সে অর্থে সাধারণ লোকের অনায়ত্তই থাকে এবং তাদের মনে কোন বিকল্প আশ্রয়ের নিরাপত্তা আনে না। ফলে আশ্রয়-চ্যুত হওয়ার ভয় এমনকি বিশেষজ্ঞকেও বিচলিত করে। আগেই বলেছি আমাদের দেশে ধর্মীয় নিরাশ্রয়তার সম্ভাবনা কি ভাবে আমাদেরকে ধর্ম-নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আতঙ্কিত করে তোলে। অথচ আমাদের দেশেও জ্ঞানের জগতে আজ বাস্তব অবস্থাটা এই রকম। আমরা কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্ত্যে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছি। অর্থনীতি, দর্শন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, প্রভৃতি নানা পর্যায়ের জ্ঞান আমাদের চেতনায় ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সহাবস্থান করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন বৃহৎ ঐক্যের আদলে তা সমগ্রতা পায় না। ধর্মবিশ্বাসও এই সমস্ত sophisticated জ্ঞানের মধ্যে কোন ঐক্য আনতে পারে না। তাই অধুনাতম পদার্থতত্ত্বের সঙ্গে হয়ত ভৌতিক বিশ্বাস পাশাপাশি ঠাসাঠাসি করে থাকে, যুক্তি পারম্পর্যে তা গ্রথিত হয় না। নানা বিরোধী অনুভব, বিশ্বাস ও যুক্তিগত সিদ্ধান্তের এক অস্বস্তিকর অবস্থা। টি. এস. এলিয়ট থেকে ভাষা ধার করে বলা যায়—dissociated sensibility-র একটা জীবনময় বোঝা। এই অবস্থায় ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করতে গিয়ে এই অস্বস্তিকরতা আমাদের স্নায়ুকে ক্লান্ত করে তোলে অথচ সমস্তটুকুকে ঢেলে যুক্তি দিয়ে সাজানোর মত মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা বা সততা আমাদের মত সাধারণ লোকের থাকে না। এ অবস্থায় বিশ্বাসটুকু ভেঙে পড়লে নিরাশ্রয় স্বাধীনতার মুখে দুর্বল মানুষ অসহায় বোধ করে। মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম একেই বলেছেন Fear of freedom। এই 'মুক্তির ভয়' থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে আকুল ভাবে যে কোন বিশ্বাসের মধ্যে সহজ পলায়নের পথ খোঁজে। বিশ্বাস সহজ, যুক্তি কঠিন ; অথচ বিশ্বাসও আর স্বস্তি বা পূর্ণতা পায় না। খণ্ডিত চেতনার গ্লানি স্পর্শকাতর অহমিকার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করে

অথবা সাম্প্রদায়িক চণ্ডনীতির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষতা জ্ঞানের জগতেও সামূহিক প্রবণতাকে উৎসাহিত করে না। ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বাধ্য করে। ধর্মীয় অন্বেষা বলতে যদি আমরা আত্মপরিচয় বা সমগ্র অর্থ বা তাৎপর্যের অন্বেষণ বুঝি তা হলে ধর্মনিরপেক্ষতাই ধর্মীয় অন্বেষার প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই অর্থের অন্বেষণ পাশ্চাত্য সমাজে সাত্র´ বা শেশ্‌টভ, কিয়েরকেগাড´ বা কার্ল বার্থ´, উনামুনো বা গাসেতের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য আমাদের চিন্তাকে ও অনুভবকেও প্রবলভাবে নাড়া না দিয়ে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মরমীয়াবাদ, বা ইয়েট্‌সের সংশ্লেষিত mythology, বা সঁা জন পার্সের মিস্টিক ইতিহাসবোধ বা ফ্রস্টের প্রকৃতি মগ্নতার মধ্যেও অনেক ক্লান্ত প্রাণ আবেগের আশ্রয় পেয়েছেন। এ সবই ধর্মবোধের পরিপূরক হতে পারে।...

কিন্তু কেউ কেউ এই অনুসন্ধানকে সর্বতোবিরোধিতা করেন। কারণ সনাতন ধর্ম যা এতকাল সামূহিক বা সমগ্রতার অর্থকে বহন করে এসেছে সেই সনাতন ধর্মের একচ্ছত্র অধিনায়কত্বে এঁরা ভাষ্য করার নামে ধর্মকে আশ্রয় করে নানা সুবিধা ভোগ করে এসেছেন। সব রকমের একাধিপত্যই দোষদুষ্ট হয়, বিশ্বাসের একাধিপত্য (Monopoly of faith) সবচেয়ে মারাত্মক। ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মীয় সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা এই অর্থ বা ভাষ্য করার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে একমাত্র রক্ষাকবচ তথা একাধিপত্যজনিত কদর্থে বা দুষ্টভাষ্যের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ ; যেমন গণতন্ত্র রাজনৈতিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা গণতন্ত্র বিরোধিতার মতই কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণী বা ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এঁরা, পুরোহিত শ্রেণী বা ধর্ম-নেতা ইত্যাদি, ভাষ্য করার একচ্ছত্র অধিকারের মধ্যে দিয়ে এই গোষ্ঠী সমাজের লোকের জীবনের সর্বস্তরে নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্প্রসারিত করেছেন।

ধর্মীয় ভাষ্য বলতে এখানে পুণ্যগ্রন্থ, দৈববাণী বা স্বপ্নদৃষ্ট অভিজ্ঞতা সব কিছুই বোঝাচ্ছি। এই শ্রেণী বা ব্যক্তিবিশেষ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সংস্কার বা দুর্বলতার প্রশ্রয়ে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রূপান্তরিত করে ফেলেন। ফলত পোপ রাজার চাইতে ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ক্ষত্রিয় রাজার উপরে স্থান পান। খলিফার প্রতিপত্তি তার রাজনৈতিক সীমানা ছাড়িয়ে অন্যদেশের জনগণের ওপরে প্রসারিত হয়। খুতবাতে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয় এবং বিভাগপূর্ব ভারতে খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে দেখেছি তা কিভাবে দূরদেশের রাজনীতিতেও বিপ্লব উপস্থিত করতে পারে। ইউরোপেও এর ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। রাষ্ট্র এবং চার্চের পৃথকীকরণ দ্বারা এই magic circle বা মন্ত্রপূত গণ্ডী ভাঙা সম্ভব হয়েছে। এই পৃথকীকরণ এসেছে ইউরোপে ফিউড্যাল সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজ তথা যন্ত্রশিল্পে বিবর্তনের সন্ধিক্ষণগুলিতে। পুঁজিবাদের বিকাশের লগ্নে গণতন্ত্রের জন্ম ও প্রসারের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাও রাজার হাত থেকে বিকেন্দ্রিত হয়ে পড়েছে। পুরোহিত শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি আরো সীমিত হয়ে পড়েছে। সমাজের একস্তর থেকে অন্যস্তরে ক্ষমতার প্রতিসরণের এই পর্যায় সহজ হয়নি মোটেও—দ্বন্দ্বে, বিক্ষোভে ও রক্তপাতে তা আবিল। টমাস বেকেটের আত্মদান, প্রথম চার্লসের হত্যা, ষোড়শ লুই বা মেরি আন্তোয়ার গিলোটিন এর নানা নাটকীয় মুহূর্ত মাত্র। ক্ষমতা সংরক্ষণের এই দীর্ঘ লড়াইতে যাজক, পুরোহিত বা মাওলানা শ্রেণী তাঁদের স্বার্থের প্রশ্নটিকে সুচতুর ভাবে গোপন করার চেষ্টা করেছেন ঐতিহ্য বা ইনস্টিটিউশ্যন প্রতিরক্ষার ধুয়া তুলে ; জনমনের আবেগগত ক্ষুধার যুক্তি বা রিচুয়ালের প্রয়োজন প্রভৃতি নানা কথা একই অর্থে আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেয়ার চেষ্টা। আমরা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত করেছি—আজকের পরিবর্তমান জটিল বিশেষজ্ঞ

শাসিত সমাজে কি ভাবে এ সমস্ত চাহিদা বা প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা কোন একটি মাত্র সামূহিক ideology-র নেই। আমাদের সমাজেও কিছু কাল ধরে এই জাতীয় পুরোহিত শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কমে আসছে। আনুপাতিক ভাবে তাদের নানা প্রতিরক্ষামূলক কার্যকলাপ বেড়ে যাচ্ছে এবং নানা পুরোনো যুক্তি আমরা নতুন করে শুনতে পাচ্ছি। যে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারের কথা উঠলেই এঁরা তার বিরোধিতা করতে থাকেন, ধর্মীয় সংস্কারের ত কথাই নেই। সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণকে সংস্কারের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে এঁরা এঁদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রসারিত করতে চান। এঁরা, যেমন, লোককে সুচতুর ভাবে বোঝাচ্ছেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্ম বিরোধিতা। এই জাতীয় প্রচার দ্বারা এঁরা লোকের ধর্মভীরুতাকে রাজনৈতিক বা সামাজিক আতঙ্কে রূপান্তরিত করে ধর্ম রাষ্ট্রের লক্ষ্যে লোককে পরিচালিত করার স্বপ্ন দেখেন। কারণ থিয়োক্রেটিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা ত থিয়োক্রাটদের হাতেই ফিরে আসবে। তার জন্য সংঘর্ষের উস্কানীও এঁরা নিরন্তর দিতে থাকবেন। এঁদের পেছনে অন্য স্বার্থ প্রণোদিত আরো কেউ থাকবে না এমন বলা যায় না।

ধর্মনিরপেক্ষতাই এই সংঘর্ষ এড়াবার উপায়ও বটে। শিক্ষা জ্ঞান ও তথ্যের বহুল প্রসার এবং শিক্ষার মাধ্যমে অনাসক্ত এবং নিরপেক্ষ মুক্ত মননের চর্চাকে সামগ্রিক ভাবে মানসিক অভ্যাসে রূপান্তরকরণ, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতে এই নিরপেক্ষতার বাস্তবায়ন এর বহুল উচ্চারিত কর্তব্য ও সমাধান। সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির রূপান্তরের মধ্যে এই প্রবণতা পূর্ণতা পাবে। মানুষের যে আত্মপরিচয় একসময় গোষ্ঠী, বা ধর্মকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছিল তার ক্ষুদ্র বেড়া ভেঙে সংস্কৃতির বৃহত্তর আঙিনায় তার নতুন পরিচয় লাভ হবে। বাংলাদেশ এই প্রবণতাকেই সত্যতর ও ভবিষ্যৎমুখী বলে জোর দিয়েছে।

ধর্মের উদ্ভবের মতই ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক চাহিদা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের কল্পনাবিলাস থেকে নয়। এটা একটা আন্তর্জাতিক সামাজিক সত্য। এর ভবিষ্যৎও আন্তর্জাতিক সমাজের প্রবণতার সঙ্গেই গ্রথিত। সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় প্রশ্নের নিষ্পত্তি অতীতেও হয়নি ভবিষ্যতেও হবে না। ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাস বা সম্প্রদায়গত সংস্কারকে উস্কেও সমস্যার সমাধান হবে না। সব ধর্মই বিশ্বাসের ওপর শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে। অথচ শুধু বিশ্বাসের প্রবণতা দিয়ে ত ধর্মের উপযোগিতা বা উৎকর্ষ প্রমাণ করা যাবে না। ব্যাঙ্ককের রাস্তায় একাধিক বৌদ্ধ তরুণ এবং তরুণী সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার দাবীতে সাম্প্রতিক কালে গায়ে পেট্রোল ঢেলে আত্মাহুতি দিয়েছেন। আমি তাঁদের মানসিক শক্তিকে শ্রদ্ধা জানাই। যে ধর্ম তাঁদেরকে এরকম মৃত্যুঞ্জয়ী প্রবল বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করে সে ধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহলী হই। কিন্তু শুধু মাত্র তাঁদের 'ঈমান' প্রবল বলেই তাঁদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ এমন মানতে পারিনে। শ্রেষ্ঠতার অন্যান্য মানদণ্ড আমার মনে এসে পড়ে। অন্ধ-বিশ্বাস দিয়ে অন্ধবিশ্বাসকে মোকাবিলা করা শ্রমের অপচয়: চারশ বছরের ক্রুসেড তার প্রমাণ। ধর্মীয় নির্যাতন বা বিভেদমূলক আচরণ যেমন শ্রমের অপচয়। ইউরোপের ইনকুইজিশন তার প্রমাণ।

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে তাই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির মুক্তি রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষ-তার মতই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যক্তিকেই এই বোঝা বইতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দায়িত্বের বোঝার মত এটাও তার নতুন অর্জিত দায়। গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা যেন এপিঠ ওপিঠ। একটি ছাড়া অন্যটি সফল হয় না।

ততকাল আমরা অন্য পক্ষের ভুল-ভ্রান্তিকে যেন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করি, অন্যের দৃষ্টির আচ্ছন্নতাকে যেন সহ্য করতে শিখি।

কথাটা ভল্টেয়ারের। আমরা প্রতিপক্ষের প্রতি সহজেই কঠোর হতে পারি; কিন্তু নিজেদের প্রতি অন্ধভাবে উদার ও আত্মসন্তুষ্ট। আমরা যেন অন্যের প্রতি উদার হতে পারি এবং নিজেদের প্রতি কঠোর। আত্ম-পরিচয় বা আত্মচেতনা যেন আত্মতুষ্টির নামান্তর না হয়। আত্মসমালোচনায় যেন শুদ্ধ হতে পারি। অন্যকে সাম্প্রদায়িক বলে গাল দিয়ে যেন নিজের সাম্প্রদায়িকতা না ঢাকি। এটা কঠিন সামাজিক আদর্শ হিসেবে। কিন্তু আদর্শকে যেন ছোট না করি। আমরা সমাজকে বদলাতে চাই, সমাজ আজ যেখানে আছে সেখানেই ফেলে রাখতে চাই না। ভীরুতা দিয়ে পরিবর্তন সাধন করা যায় না। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যও সাহসের প্রয়োজন।

তৃতীয় দিনের আলোচনা

অধ্যাপক হাসিবুল হোসেন,
সমাজতত্ত্ব বিভাগ :

মানুষের জীবনে দুটো উপাদান আছে reason ও unreason। মানুষের জাগতিক জীবনে এই reason বা যুক্তির ওপর নির্ভর করি। কিন্তু সেখানেও যুক্তি দ্বারা আমরা সবসময় চালিত হই না। সে যাই হোক, মানুষের জাগতিক প্রয়োজন মিটে যাবার পরও একটা sphere থাকে যেটা আবেগের। ধর্ম এই irrational sphere এর ব্যাপার। ধর্ম হচ্ছে একটা ultimate-এর জগৎ যেখানে যুক্তি আর আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। এটা আসলে আবেগের সমস্যা—মানুষের একটা কিছুতে বিশ্বাস করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যা তার নানা প্রশ্ন, যার কোন যৌক্তিক উত্তর হয় না, তার চাহিদা মেটায় : যেমন কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব ইত্যাদি। এই বিশ্বাস ঈশ্বরকে আশ্রয় করে হতে পারে, বা অনেকের জন্য অন্যর কমও হতে পারে। কিন্তু একরকম না একরকম faith system বা belief system-এর তার দরকার হয়। অনির্বচনীয়কে নিয়ে যেমন একজাতীয় mystic বিশ্বাস হতে পারে। ইউরোপের মিস্টিক কবিতা উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। ধর্ম তাই সর্বলোকে আবহমান কাল ধরে চলে এসেছে। তাই আমার মনে হয় মানুষ যতদিন আছে ধর্ম থাকবে। মানুষের জীবনে ধর্মের মতই অনেক অযৌক্তিক আনন্দের উৎস তার কবিতা, চিত্রকলা, সঙ্গীত ইত্যাদিও। ধর্মও এ সমস্তকে সমৃদ্ধশালী করেছে।

এখন আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে, মানুষ আছে, ধর্ম আছে, আর তার পাশাপাশি আছে রাষ্ট্র। ধর্মীয় আদর্শ এক সময় রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছে সত্য। কিন্তু এখন সমস্যা হল এমন কোন রাষ্ট্র পৃথিবীতে নেই যেখানে শুধু মাত্র একটি ধর্মের লোক বাস করে। নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায় নানা ভাষাভাষী লোক ও সংস্কৃতি নিয়ে এক একটি আধুনিক রাষ্ট্রের কারবার। বাংলাদেশও তাই। তাছাড়া আজকাল আর কোন সমাজই একলা এক প্রান্তে পড়ে নেই। নানা আন্তর্জাতিক লেনদেনের মধ্যে তাকে আসতে হচ্ছে। দেশের লোক বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশের লোক দেশে আসছে। তার অর্থনীতি, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক নানারকম সম্পর্ক পাতাতে হচ্ছে অন্য দেশের সঙ্গে, অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকজনের সঙ্গে। প্রত্যেক সমাজেই, এমন কি আদিমতম আদিবাসী সমাজেও—অনেক ধর্মজিজ্ঞাসু লোক বাস করেন—তাঁদের বিভিন্ন বিশ্বাস, বিভিন্ন নীতিবোধ বিভিন্ন রীতি ও আচার থাকে। যেমন মুসলমানদের মধ্যে cousin বিয়ে আছে, কোন কোন খৃষ্টান বা হিন্দুদের মধ্যে যা incest বা অজাচারের পর্যায়ে পড়ে। কাজেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নীতিবোধের মধ্যে রাষ্ট্রকে একটা সমন্বয় করতে হয়। অনেক সময় ব্যক্তির আদর্শ ও রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যেও বিরোধ থাকতে পারে—সমন্বয় সেজন্যও দরকার। রাষ্ট্রীয় আইন তাই সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হওয়ার দরকার দেখা দেয়। আইনকে তাই Rational এবং Reasonable হতে হয়। তবে Rational হলেই হবে না, তাকে গ্রহণযোগ্যও করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত হলেই সব আইন গৃহীত হয় না, হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ যেমন। আমাদের দেশে সহবাস সম্মতি আইন যখন প্রথম প্রণীত হয়, তাও সহজে গৃহীত হয় নি—লোকে আইন বাঁচিয়ে বাল্যবিবাহ দিয়েছে। তবে আইন সুচিন্তিত না হলে আবার এক সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে অন্য সমস্যা তৈরী করে।

রাষ্ট্রের তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে নীতিবোধ ও এ্যাটিট্যুড তার মধ্যে একটা harmony of interest করার প্রয়োজন, অন্যথায় সমাজে

উত্তেজনা, অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা ও চাপা গোলমাল হতে থাকে। তাই সকলের বিশ্বাসকে, সকলের মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। এমন কি ব্যক্তিকেও, সে একা হলেও, শ্রদ্ধা করতে হবে। ব্যক্তির আদর্শ আর রাষ্ট্রের গৃহীত কর্মপন্থা সবসময় এক নাও হতে পারে। একজন ব্যক্তি যেমন pacifist বা যুদ্ধবিরোধী হতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্র যদি আক্রান্ত হয় তবে সে ঐ ব্যক্তিকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করবে কি না? ইংরেজিতে couscientious objector বলে একটা কথা আছে; অর্থাৎ ব্যক্তিকেও তার বিবেক সমর্থিত প্রতিবাদের অধিকার দেয়া আছে। তবে জনকল্যাণের খাতিরে বা রাষ্ট্রের অস্তিত্বই যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে, তবে ঐ ব্যক্তির ওপরেও হস্তক্ষেপ করতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া আরেকটা নীতি আছে,-সেটা গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের অনেক সংজ্ঞার মধ্যে একটি সংজ্ঞা হল, মাথা ভাঙাভাঙি বন্ধ করে, মাথা গুণে দেখা: 'Stop breaking heads and start counting heads'. অর্থাৎ গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটা সমাজব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের, প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার ও বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তাই গণতন্ত্র সব রকমের মত, আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি সমান উদার—hospitable to all ideology। তবে কোন আদর্শের প্রচার বা অনুসরণ করতে গিয়ে যেন বলপ্রয়োগ বা সংঘর্ষ দেখা না দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতাও আসলে তাই। আপনার ধর্মবিশ্বাস বা আদর্শ অনুসরণ করার স্বাধীনতা আপনার থাকবে, আমারও ধর্মবিশ্বাস বা আদর্শ অনুসরণ করার স্বাধীনতা আমার থাকবে। তবে এই দুই আদর্শ বা সম্প্রদায় যাতে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত না হয় এবং সামাজিক শান্তি ভঙ্গ করে রাষ্ট্রীয় সংকট ডেকে নিয়ে না আসে তা রাষ্ট্র দেখবে।

বাংলাদেশের এই আদর্শ অনুসৃত হবার ক্ষেত্রে আমি কোন আপত্তি দেখি না। বাংলাদেশে শুধু চারটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ই নেই, এছাড়াও

নানারকম সম্প্রদায় আছে চাকমা, সাঁওতাল, কোল, ভিল প্রভৃতি নানা বিশ্বাসের উপজাতি আছে। আরো অনেক রকম মত ও বিশ্বাসের লোক থাকতে পারে। সকসকে নিয়েই আমাদের বাংলাদেশের সমাজ। সকলের ধর্ম বিশ্বাসই তাঁদের জীবনে রঙ ও রূপ এনে দিয়েছে – ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারাই আমরা এই বৈচিত্র্য রক্ষা করব। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

অধ্যাপক চৌধুরী জুলফিকার মতিন,
বাংলা বিভাগ :

ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যতের প্রশ্নটি ধর্মের ভবিষ্যৎ থেকে আলাদা করে দেখা যাবে না। আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত অনুভব ও চারিদিকে যা দেখছি ও শুনছি তার ভিত্তিতে এ সম্বন্ধে আমার চিন্তাকে তুলে ধরতে পারি। স্পষ্টতই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, বিশেষত ইউরোপে, ধর্মের প্রভাব কমে গেছে। ধর্মে আস্থাশীল লোকের হয়ত অভাব নেই। কিন্তু সামাজিক জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুশাসনগুলি যথাযথ মেনে চলেন এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। কেন এমনটা হল ভাবতে গেলে ধর্মের উৎপত্তি ও উৎসের দিকে তাকাতে হয়।

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মনীষী নানা রকম কথা বলে গেছেন। ধর্ম মানুষের অনুভূতিময় মনের প্রকাশ। কেউ বলেছেন মানুষের পাপবোধ থেকেই ধর্মের উৎপত্তি ; মানুষ পাপ বা অন্যায় করে বলেই তার সহজাত বিবেকবোধে একরকম না একরকম আশ্রয় চায় সান্ত্বনার জন্য বা পাপ স্খালনের জন্য। আদিম সমাজে জীবিকা আহরণের সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রজাল

থেকে ধর্মের উৎপত্তি বলে বলেন অনেক নৃতত্ত্ববিদ। পূর্ব-পুরুষের পুজা থেকে এর উৎপত্তি এমনও বলেন অন্যদল নৃবিজ্ঞানী। তবে এর উদ্ভবের এক বা একাধিক কারণ যাই থাক না কেন, ধর্ম উদ্ভবের যুগ থেকেই ধর্মের একটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা ছিল। মানুষের সামাজিক জীবনকে সংগঠিত করা এবং তার অনুভূতিময় মনকে সন্তুষ্ট করা এই দুই দিকই ধর্ম পালন করেছে দীর্ঘকাল। ধর্মের এই মঙ্গলময় দিক বা তার প্রগতিশীল ভূমিকা কিন্তু সামাজিক জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। ব্যক্তি মানুষের হাতে পড়ে, সুবিধাবাদী লোকের হাতে পড়ে, শ্রেণী বিশেষের হাতে পড়ে, ধর্ম অত্যাচারের অনাচারের হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহৃত হতে লাগল। অনেক সময় আমরা দেখেছি যে এই জাতীয় অনাচার বা অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য লোক এক ধর্ম ছেড়ে দিয়ে নতুন ধর্মের পত্তন করেছে। ইসলাম ধর্মের বা বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের মধ্যে এর প্রমাণ আছে। এই ভাবে ধর্মের সঙ্গে অর্থনীতি বা সমাজ জড়িত। সামাজিক বিদ্রোহ ধর্মের সংঘাতের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু নতুন ধর্ম ও অনাচার অত্যাচার থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে নি।

ধর্মের প্রগতিশীল ভূমিকা তাই সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। সমাজের পরিধি হয়ত পরিবর্ধিত হয়, অর্থনীতির সীমানা বেড়ে যায়—নানা জটিলতা দেখা দেয়। ধর্মের উদ্ভবের সময় থেকে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। মানুষের খাওয়াপরার যে ব্যবস্থা তার সঙ্গে আর ধর্মের কোন প্রত্যক্ষ যোগ দীর্ঘকাল ধরেই নেই। সমাজে জীবিকা নির্বাহের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মানসিকতাতেও নানা পরিবর্তন এসেছে। মানুষের চিন্তা অনেকাংশে মুক্ত হয়ে গেছে। বিশেষ করে মধ্যযুগ থেকে যখন আধুনিক যুগে প্রবেশ করলাম নানা রকম পরিবর্তনের স্রোত যেন আমাদের জীবনযাত্রাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে. আমাদের চিন্তায় যেমন নানা সংস্কৃতি এসে মিশেছে। একদিকে বিজ্ঞান

যেমন বস্তু জগৎকে আবিষ্কার করল এবং অর্থনীতিকে অভাবিতভাবে পুনর্নির্মাণ করে অফুরন্ত প্রাচুর্য এনে দিল, জীবনে নতুন উল্লাসের সূচনা করল। কাজেই মধ্যযুগে ধর্ম বলতেই যে স্বর্গনরকের চেতনা, পাপপুণ্যবোধ মানুষকে আচ্ছন্ন করে ছিল আধুনিক মানুষকে তা আর একই রকম ভাবে বিচলিত করে না। এই জীবনের প্রতি আসক্তি বেড়ে গেছে, নীতিবোধ বা মনোভাব যাচ্ছে পাল্টে। ইচ্ছা পুরণের উপায় এখন লোকের হাতের মুঠোয়। এসব কিছু যুক্ত হয়েছে নানা সংস্কৃতির সঙ্গে, নানা চিন্তার সঙ্গে পরিচয় যা বিজ্ঞানের ফলাফল হিসাবে এসেছে। ব্যবহারিক জীবন যত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ততই প্রচলিত নৈতিক বিধান সম্বন্ধে আস্থা শিথিল হয়ে যাচ্ছে, এবং অসন্তোষ বাড়ছে। নতুন বিশ্বাসের বা চিন্তা পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে মার্কসের চিন্তা বিশেষ করে সমাজ ও ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাক্তন সমস্ত ধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছে। আবার মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের আবিষ্কার যেমন ব্যক্তি, তার ধর্ম এবং তার নৈতিকতা সম্বন্ধে অবশিষ্ট ধারণাটুকুও দিয়েছে চুরমার করে। অন্যদিকে বিজ্ঞান প্রাচুর্যের পর প্রাচুর্য জমা করে তুলছে। মানুষ অনিবার্য ভাবে বস্তুবাদী হয়ে পড়ছে। প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসগুলি শিথিলই হয়ে যায়নি তার কাছে, - খেলো হয়ে গেছে। ফ্রয়েড প্রভৃতির আবিষ্কারের ফলে নানা বিব্রতকর অনুভূতি, নানা অস্থিরতা ও অনুভব থেকে ধর্ম আর তাকে রক্ষা করতে পারছে না। এই যে প্রক্রিয়া ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে শুরু হয়েছে তা এখনো চলছে এবং চলতে থাকবে। এখন আর শুধু হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতির বিরোধ বা মিলনই হচ্ছে না। অহরহ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে নানা সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের উপর এসে পড়ছে। ফলে ব্যক্তির ধর্মচিন্তায় সংকট ঘনীভূত হচ্ছে ; এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

সমাজে সকলে যে একভাবে এই সমস্ত চিন্তা দ্বারা আলোড়িত হচ্ছে তা নয়। তবে সাধারণভাবে বেশীর ভাগ লোকই ধর্মে উদাসীন হয়ে

পড়ছে। ধর্মের এক সময় একটা প্রত্যক্ষ সামাজিক প্রয়োগ ছিল এখন সেদিক দিয়েও ধর্ম অপ্রাসঙ্গিক বা অনুপযোগী হয়ে পড়ছে ; ফলে আস্থা আরো বিচলিত হয়ে যাচ্ছে।

এরকম অবস্থা আমরা চাই না চাই আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। চোখ বুঁজে অস্বীকার করলেও অস্বীকার করা যাবে না। কাজেই ধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই আমার মনে ঘোর সন্দেহ আছে। সেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎও প্রশ্নসাপেক্ষ।

ডক্টর ফররুখ খলীল,
গণিত বিভাগ :

ধর্মনিরপেক্ষতার ওপরে যে আলোচনা তিনদিন ধরে হচ্ছে তা আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি তবে স্পষ্টতই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের অস্তিত্ব মোটেই বিপন্ন নয়। অতএব এ ব্যাপারে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ধর্ম পালন করার নাম করে অবশ্য অন্য ধর্মাবলম্বী বা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়ের শান্তি, স্বস্তি বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অধিকারও কেউ পেতে পারেন না। আমার কাছে কোন লোক ধর্ম পালন করছে না বলে মনে হল বা সত্যধর্ম পালন না করে অন্য ধর্ম পালন করছে বলে মনে হল অমনি গিয়ে তার নিরিবিলি জীবনের বা তার বিশ্বাসের ওপর হস্তক্ষেপ করব এটা রাষ্ট্র অনুমোদন করতে পারে না। তার যে কোন রাজনৈতিক দলে থাকা না থাকা বা উদাসীন থাকার যেমন অধিকার আছে, ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনি। আমার মনে হয় ধর্ম যদি শুধু ধর্ম পালনের জন্য হয়, ধর্ম যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য না হয়. সামাজিক প্রভাব

প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য না হয় তবে সম্প্রদায়গত বিভেদ বা দ্বন্দ্ব বা সংঘাত হতে পারে না। সংঘাত তখনই হয় যখন সংঘাতের মধ্য দিয়ে কেউ বা কোন সম্প্রদায় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়ানোর অবৈধ চেষ্টা করেন। এই দিক থেকে দেখলে ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মনে হয়।

অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষ,
দর্শন বিভাগ :

ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যতের প্রশ্নটিকে মানুষের নৈতিক চেতনার বিবর্তনের দিক থেকে দেখা যেতে পারে। মানুষের নৈতিক চেতনার বিবর্তনের কয়েকটি পর্যায় আমরা ইতিহাসে লক্ষ্য করি। সুবিন্যস্ত সংগঠিত ধর্ম বলতে আমরা আজকে যা বুঝি মানুষের সভ্যতার একেবারে শুরুতে ধর্ম হয়ত এতটা সুবিন্যস্ত ছিল না, কিন্তু ধর্মীয় চেতনা ছিল—যে চেতনা মূলত নীতিবোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই নীতিবোধকে বলি প্রাকধর্মীয় নীতিবোধ। ধর্মীয় বিকাশের পরিণত স্তরে এই নীতিবোধ বিশেষ বিশেষ ধর্মের ঐহিক ও পারত্রিক দিকগুলির সঙ্গে মিশে গেছে এবং এই পর্যায়কে বলা যায় ধর্মাশ্রিত নীতিবোধ। রেনেসাঁ উত্তর ইউরোপে বিশুদ্ধ যুক্তিভিত্তিক দর্শন চিন্তার বিকাশের ফলে মননশীল ব্যক্তিরা নীতি-বোধকে সর্বধর্মসার মেনে নিয়ে তাকে বিশেষ বিশেষ ধর্মের আওতা থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এটাকে বলা যায় ধর্মোত্তর নীতিবোধ। মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা এই নীতিবোধের প্রেরণা ও আদর্শ। ধর্ম, সম্প্রদায়, বিশ্বাস, অবিশ্বাস নিরপেক্ষ পৃথিবীর সকল মানুষ

আশ্রয় পায় এই নীতিবোধের মধ্যে। তাই একে বলা যায় মানবিক নীতি-বোধ। ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তিম লক্ষ্য এই মানবিকতাকে উজ্জীবিত করায়। এই বিবর্তন অবাস্তব কল্পনা নয়। পাশ্চাত্যের লক্ষ লক্ষ লোক এই মানবিক নীতিবোধের পর্যায়ে পৌঁছেছেন তাঁদের চিন্তায় কর্মে এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে। নিজস্ব সনাতন ধর্মের সত্য অনুশীলন করেও এই নৈতিক আদর্শের সমীপবর্তী হওয়া চলে। সাধারণ লোক যিনি ধর্মানুশীলনের মধ্য দিয়ে মুক্তি খুঁজছেন তিনিও যেমন এই মানবিক আদর্শেই এসে পৌঁছুবেন তেমনি একজন বুদ্ধিচর্চাকারী নাস্তিকও এই মানবিক নীতি-বোধকে তাঁর জীবনযাত্রার মান হিসেবে গ্রহণ করেন। সেক্যুলরিজম তার উপযোগী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে।

'সেক্যুলরিজম' কথাটি তাই ধর্মনিরপেক্ষতার চাইতে ব্যাপক। দার্শনিক রাসেলকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি কি সমাজতন্ত্রবাদী না গণতন্ত্রবাদী না কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি ওসব কিছুই নন, তিনি 'সেক্যুলর'। অর্থাৎ তিনি মনকে মুক্ত রেখেছেন; কোন মত বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত হতে তিনি রাজী নন।

আবার ধর্মবিরোধী হওয়া বা নাস্তিক হওয়া আর সেক্যুলর হওয়া এক কথা নয়। যেমন ধরা যাক নীটশে। তিনি নাস্তিক ছিলেন, এবং প্রবল-ভাবে খৃষ্টানবিরোধী ছিলেন কিন্তু তিনি সেক্যুলর ছিলেন না। তাঁর অতি-মানববাদ চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতাকে লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং নীটশে মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজমসহ সব রকম ইউম্যানিস্ট কার্য-ক্রমকে অনুকম্পার চোখে দেখেছেন। সমষ্টিকে ব্যক্তির পায়ে বলি দিয়ে তার এই অতিমানবের পূজা তাই শেষ বিচারে মানবতাবিরোধী ও সেক্যুলরিজম বিরোধী। অন্যদিকে মিলের কাছে ইউটিলিটারিয়ানিজম হিউম্যানিজম এবং সেক্যুলরিজম সমার্থক। অথচ মিলও নাস্তিক।

জিয়াউল ইসলাম হিলালী :

ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যতের প্রশ্নটির আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে একটা যোগ আছে। যেমন সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশতন্ত্রের সঙ্গে এর একটা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে। ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়েছে সত্য। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টি করেই তারা নিরপেক্ষ বসে নেই। পাকিস্তানে যে গণতন্ত্র হল না, ধর্মান্ধতা যে ক্রমেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসে অসহিষ্ণুতাকে প্রাধান্য দিল এর পেছনে বাইরেরও হাত আছে। অনুন্নত প্রাক্তন উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-শালী দেশগুলি নানাভাবে ঐ সমস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নানা ফিকিরে ঢোকার পথ করে রাখে। বর্ণ-বৈষম্য, ধর্মীয় মারামারি প্রভৃতি সমাজে থাকলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সূচনা হয় এবং বৃহৎ শক্তিগুলির ঢোকার সুবিধা হয়। আলী আনোয়ার সাহেবের সূত্র ধরে বলতে চাই যে, ব্যাঙ্ককে বৌদ্ধদের বিদ্রোহ ও তরুণতরুণীদের আত্মদান শুধু মাত্র ধর্মীয় মহত্ত্ব বা সাহস দেখাবার ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হয়নি, রাজনৈতিক কার্যকারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আয়ারল্যাণ্ডে আজ রাজনৈতিক যুদ্ধ ও অর্থ-নৈতিক প্রতিবাদ ধর্মকলহের মধ্যে পর্যবসিত হয়েছে। বহিরাগত প্রটেস্টান্ট পুঁজিপতি ও শিল্পাশ্রিত ঔপনিবেশিক ইংরেজের সঙ্গে স্থানীয় গরীব ক্যাথলিক আইরীশ কৃষকের ও শ্রমিকের বিরোধ আজ নতুন নয়। কিন্তু অর্থনীতিক প্রশ্নকে আজ ধর্মীয় প্রশ্ন দ্বারা চাপা দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে। তবে চক্রান্ত শুধু ধর্মীয় বিরোধকে উস্কাতে পারে। এ ব্যাপারে দেশের সুবিধাভোগী শ্রেণীর কার্যকলাপ ও নীতির পেছনে বাইরের বৃহৎ শক্তির সমর্থন বা গোপন প্ররোচনা থাকতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ মনে পড়ে। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার অমানুষিক বর্ণ-বৈষম্যের জন্য সত্যি সত্যি ঐ দেশের শ্বেতকায়দের বহির্বিশ্বে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি।

ধর্মকে আমাদের দেশে অতীতে যেহেতু রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র চাই বা ধর্ম'-নিরপেক্ষতা চাই—তাই আন্তর্জাতিক পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের নানা অভি-সন্ধি সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে ; না হলে ধর্ম'নিরপেক্ষতা বানচাল হয়ে যাবে এবং বানচাল হবে গণতন্ত্র।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সমস্যা রাজনৈতিক, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে হিন্দু-মুসলমান ধর্মে'র পুরোনো জিগির তুলে,—যদি এই সম্পর্ককে বানচাল করে দেয়া যায় তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির যে বিশেষ সুবিধা হবে তাতে আর সন্দেহ কি। ধর্ম এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের হাতে একটা সুচতুর অস্ত্রের মতো ব্যবহৃত হবে। সেই জন্যই আমার মনে হয় সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যতের পক্ষেই ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎও জড়িয়ে আছে।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন :

ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যং নিয়ে আলোচনার কথা। কিন্তু অতীত ও বর্তমান নিয়ে আলোচনা না করে তো আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা যায় না। এই কারণেই আমরা অতীত ও বর্তমান নিয়ে বারবার আলোচনা করছি। আপনারা বেয়াদপী মাপ করবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষার কথা তুলে মুরশিদ সাহেব সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। আজ মাদ্রাসা শিক্ষাকে রাতারাতি তুলে দিলে

অনেকের মনে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, একথা আমরা ভেবে দেখেছি কি ? আমার ধারণা এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাই সফল হবে না। যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছেন, তাঁদের আমি সাবধান করে দিতে চাই যে, মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার চেষ্টা করবেন না।

ধর্মকে যেন রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা না হয়, একথা সকলেই বলে যাচ্ছেন। ধর্মকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহারের আর প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ধর্মাশ্রিত রাজনৈতিক দলগুলিত ইতিমধ্যে নিষিদ্ধই করা হয়েছে। ভারতেও এটা হয় নি। এমতাবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে তিনদিন-ব্যাপী আলোচনারও প্রয়োজন আছে কি ?

ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ,
উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগ :

আমার পূর্ব-পুরুষ কবিয়াল ছিলেন, তাঁরা তরজা গান করতেন। আমার মধ্যেও সেই তর্কযুদ্ধের রেশ চলে এসে থাকবে। তাই আমার কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার একটা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত আছে। এ প্রশ্নটি আমাদের কাছে দার্শনিক প্রশ্ন হিসেবে আসে নি। দার্শনিক দিক থেকে বহু আগেই অনেকে এর সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। আজকে বিশেষ করে যে আমাদের সামনে প্রশ্নটি এসেছে তার কারণ রাজনৈতিক। আমাদের রাষ্ট্রনায়করা দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করেছেন, সংবিধানও সেইভাবে রচিত হবে তবু যে আজ ধর্মনিরপেক্ষতা

নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তার মানে আমাদের মনে একটা কিন্তু থেকে গেছে। আমাদের সমাজ পরিবেশেই এমন কিছু আছে যা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। সেই জন্যেই সমাজের কথা কিছু বলে নিতে হবে। শুধুমাত্র এ্যাকাডেমিক আলোচনা করে কিছু হবে না। এ্যাকাডেমিকরা চিন্তার গজদন্ত মিনারে বাস করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা এ্যাকাডেমিকদের কাছে দার্শনিক দিক থেকে আলোচনার যোগ্য হয়ত। কিন্তু এটা সমাজে একটা বাস্তব সত্য হিসেবেই দেখা দিয়েছে এবং তার পেছনে আছে প্রয়োজন।

ব্যাপার হচ্ছে যে, আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্য দিয়ে অতীত সাম্প্র-দায়িকতাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি। ১৯৬১ সনের লোক গণনার হিসেব অনুযায়ী এদেশে জনসংখ্যার সম্প্রদায়গত হিসাব হল মুসলমান ৮০ ৭৩% বর্ণহিন্দু ৮'১২%, তপশিলী সম্প্রদায় ৯'১২%. খৃষ্টান ০'৬৯%. বৌদ্ধ০' ৪৭%. অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় ০ ৩৯%। গত নির্বাচন, বা অসহযোগের সময় আমরা দেখেছি যে মুসলমানদের সঙ্গে সংখ্যালঘুরাও জয় বাংলার ডাকে সাড়া দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও তারা সমানভাবে নির্যাতনই ভাগ করে নেয়নি তারা বাংলাদেশের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছে। দেশে যদি ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হয় তবে এখান থেকে একটা নির্দেশ পাচ্ছি। এদেরকে আমরা সংগ্রামে ডেকেছিলাম এবং এরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে সার্থক করতে হলে এই জাতীয়তাবাদের বুনিয়াদকেই জোরদার করতে হবে।

অনেকে বামপন্থীরা বিশেষ করে উদারনৈতিক মনোভাব নিয়ে বলেন যে, জাতীয়তাবাদ সেকেলে হয়ে গেছে। কিন্তু এই জাতীয় মনোভাবকে প্রশ্রয় দিলে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আবার

সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেবে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালীদের ঐক্যই আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। বাংলাদেশের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের একজন প্রধান যোদ্ধা অরবিন্দ বলেছিলেন 'Nationalism is the religion of the future'। বাঙালীদেরকেও এই জাতীয়তাবাদকেই আশ্রয় করতে হবে টিঁকে থাকতে হলে।

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক,
মনস্তত্ত্ব বিভাগ :

ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ব্যক্তিগত পরিচয় নেই বলেই এত দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি একটি অত্যন্ত স্থূল উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বিশদ করতে চাই—উদাহরণটি কৌতুককরও বটে। এই আলোচনা সভার প্রথম অধিবেশনে মিসেস জোন হোসেন ধর্মের প্রতি সাধারণভাবে তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথা বলেছেন এবং তিনি একজন খৃষ্টান। আজকে খানিকক্ষণ আগে জনাব হাসিবুল হোসেন বলেছেন : 'ধর্ম আছে, ধর্ম থাকবে' এবং তিনি একজন মুসলমান। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী। আমি একেই বলি ধর্মনিরপেক্ষতা (প্রবল হাস্যরোল)। এঁরা যদি পরস্পরের গলা না কেটে দীর্ঘ দাম্পত্য-জীবন কাটাতে পেরে থাকেন, তাহলে একই কারণে ধর্মনিরপেক্ষতারও ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল বলে মনে করি। (প্রচুর সহাস্য করতালি)

কাজী গোলাম মোস্তফা :

এখানে যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা সমাজের বিকাশ ও গতিপ্রকৃতির আলোচনা করেই ধর্মনিরপেক্ষতার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ব্যক্তিগত ভাল

লাগা মন্দলাগার ভিত্তিতে নয়। তাঁদের সাধুবাদ দেই ও আমি তাঁদের সাথে একমত।

কিন্তু শুধুমাত্র ইতিহাস পাঠ করেই ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নেয়া যায় না। কল্যাণবোধকেও এর সাথে মেলাতে হবে। এই কল্যাণের তাগিদই আজ এই ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনায় সক্রিয় বলে মনে করি।

অধ্যাপক আলী আনোয়ারের প্রত্যুত্তর :

ধর্মসংক্রান্ত কোন আলোচনা নিরাসক্তভাবে করা যে কত কঠিন তা আমরা এই আলোচনা সভায়ই বার বার দেখেছি। আমরা ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এর কিছু কারণ সম্বন্ধে আমি আমার লেখায় আলোচনা করেছি। আমারা আলোচনায় কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাত নেই—সাধারণভাবে ধর্ম এবং সমাজ পরিবর্তনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

সমাজ পরিবর্তন তথা সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রয়োজনে কি ভাবে ও কেন ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হল তার দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। ধর্মনিরপেক্ষতা একটি আন্তর্জাতিক প্রবণতা—পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, অর্থনীতির মত এটিও একটি সামাজিক ভাবে উপযোগী ধারণা হিসেবেই পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ও অনুন্নত দেশে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কোন বিশেষ ধর্মের বিরোধিতা তার লক্ষ্য নয়। অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধি যেমন শ্রমবিভাজনের পথ ধরে এসেছে,—জ্ঞানের জগতে যা রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভাজনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত,

সেক্যুলরিজম সেই একই শ্রমবিভাজনের সামগ্রিক ফল। এখানে আবারও মনে করিয়ে দেয়া দরকার যে, সেক্যুলরিজম শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতা বা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা নয়, তা জ্ঞানের জগতেও নিরাসক্ত মননের দাবী করে।

সামাজিক অন্যায় বা অর্থনৈতিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিভিন্ন ধর্মে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও যে আজকের সোস্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংএ ধর্ম-সমূহ উপযোগী হয়ে উঠল না বা স্থায়ী প্রভাব রাখতে পারল না তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, সব ধর্মেই এই বিক্ষোভ বা দুঃখভোগকে সমাজ পরিবর্তনের আবেগ হিসেবে ব্যবহার করার চাইতে আত্মিক মুক্তির একটা উপায় হিসেবেও দেখা হয়েছে। ধর্মীয় অর্থবিন্যাসে ব্যক্তিজীবনে দুঃখের তাৎপর্য গেছে বদলে। কিন্তু আমরা আলোচনা করছি সামাজিক মুক্তি নিয়ে। ধর্মনিরপেক্ষতার উপযোগিতা ও ভবিষ্যৎ সে পথেই নির্ণিত হবে।

স ভা প তি র অ ভি ভা ষ ণ

ডক্টর মফিজ উদ্দীন আহমদ
দর্শন বিভাগ

তিনদিন ধরে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে যে বহুমুখী আলোচনা হয়েছে তারপরে নতুন কিছু বলার মত সুযোগ আছে কি না সন্দেহ করি। আমরা বিগত আলোচনা থেকে কয়েকটি মূলসূত্রের পুনরাবৃত্তি করতে পারি মাত্র।

ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি ধর্মহীনতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েই, সব ধর্মকে স্বীকার করে নিলেই, নিরপেক্ষতার ধারণাটি জন্মলাভ করতে পারে। এটি একটি আপেক্ষিক ধারণা ; এর কোন নির্দিষ্ট সর্বকালীন চূড়ান্ত রূপ নেই ; বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সমাজ বিভিন্নভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণায় উপনীত হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে তা আচরিত হয়েছে। আপেক্ষিক আরো এই কারণে যে, এর একটা রাজনৈতিক দিক আছে—যা আইন, শাসনতন্ত্র প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। এর একটা সামাজিক দিক আছে যা আইনের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং প্রথা বা দীর্ঘ সামাজিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু আইনের দ্বারা করা যায় না। অন্যদিকে এর একটা ব্যক্তিগত দিকও আছে যেখানে এটা ব্যক্তির চিন্তা ও তার এ্যাটিট্যুড এর সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন নিজ ধর্ম পালন করেও, বা নাস্তিক হয়েও, একজন ব্যক্তির পক্ষে নিরপেক্ষতা সম্ভব। আমাদের সমাজেও এরকম লোক অনেক আছেন।

জনৈক ছাত্রবন্ধু ধর্মান্তরের দুঃখজনক উদাহরণের কথা তুলেছেন। একে আমরা সংস্কৃতির বিরোধই বলি আর ধর্মের বিরোধই বলি আর সামাদ সাহেবেরঅ নুসরণে endogamous unit-এর বিরোধই বলি—যেটা অহরহ দেখতে পাই সেটা হল যে, এই পরিচয়গুলি চিরন্তন সত্তা নয়। একই সংস্কৃতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ হয়েছে—যারা endogamous ভাবে এক; আবার একই ধর্মের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে বিরোধ হয়েছে—যেখানে সংস্কৃতির বিরোধ নেই। বিরোধের দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়নি, সম্প্রদায়ও অবলুপ্ত হয়নি। সম্প্রদায় আছে এবং থাকবে, তাই বলেই সাম্প্রদায়িকতা বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এটা সমর্থন করা যায় না। সম্প্রদায় আছে এবং থাকবে বলেই সেক্যুলারিজম দরকার।

এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে, গতকাল সামাদ সাহেব স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্বের কথা তুলেছেন। আমার নিজের সমাজের প্রতি, সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব আমার নিশ্চয়ই আছে। সে দায়িত্ব হচ্ছে আমার সমাজকে সামনে নিয়ে যাওয়ার – তাকে স্থানু, অনড়, অচল ঠুঁটো করে রেখে দেওয়ায় নয়। স্বীয় দেশ সমাজ বা সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যদি যুক্তি হত, তাহলে পাকিস্তান থেকে আজ বাংলাদেশ হতে পারত না। কারণ একই যুক্তি অনুসারে পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের দায়িত্ব হত। কোন পরাধীন দেশ তাহলে আর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পারত না—কারণ স্থিতাবস্থা বা প্রচলিত সমাজকে টিঁকিয়ে রাখাই ঐ সমাজের লোকের দায়িত্ব হয়। এক কথায় কোন পরিবর্তনই আর সম্ভব হত না।

সেক্যুলার রাষ্ট্রে মুসলমান সম্প্রদায় কেন মারা পড়বে, এটা আমি বুঝতে পারি না। সেক্যুলার জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন বা আমেরিকায় কি খৃষ্টান সম্প্রদায় মারা পড়েছে? না ইহুদীরাই মারা পড়েছে এসব রাষ্ট্রে—হিটলারের প্রচণ্ড চেষ্টা সত্ত্বেও? আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমার সম্প্রদায়কে,

সমাজকে এবং দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া। সেক্যুলারিজম তার প্রতিবন্ধক নয়। কারণ সেক্যুলারিজম সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, মজহাবে-মজহাবে বিদ্বেষ ও হানাহানি বন্ধ করতে চায়—তাকে উৎসাহিত করতে চায় না।

ভারতের ইতিহাসে ১৯৪৭ সনে রাম ও রহিম 'জুদা' হয়ে গেছে ঠিকই। তার ঐতিহাসিক কারণ ছিল। ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন বা আশা বা মোহ। কিন্তু দেখলাম, রহিম ও করিম 'জুদা', আলাদা, হয়ে গেল। 'দিলকে সাচ্চা' রাখা যায়নি। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেল। ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তা মিথ্যা মরীচিকা প্রমাণিত হল। ভুলে গেলে চলবে না যে, বাঙালী মুসলমানদের সুপরিকল্পিত উপায়ে দীর্ঘ গণহত্যার মাধ্যমে পোষমানা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছিল—কোন সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তা আপনারা জানেন। অথচ বিহারী মুসলমানদেরকে আজ ভুট্টো পাকিস্তানে নিতে চাইছেন না, নানা তাল বাহানা করছেন—যদিও তারাও ধর্মের ভাই। সামাদ সাহেবের মত আমাদের যাদের বয়েস হয়েছে, তারা এসবও ভেবে দেখতে চাই।

ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ম ও ধর্মহীনতার মধ্যে মধ্যপথ কি না, এমন প্রশ্ন কারো কারো মনে আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা মধ্যপথ নয়, কোন পথই নয়—এটা পথ খুঁজে নেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে মাত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ম সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নয়। এটা একটা সামাজিক নীতি, সহিষ্ণুতার নীতি।

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে যেমন বিভিন্ন ধর্ম সহাবস্থান করতে পারে, তেমনি ধার্মিক ও নাস্তিকও সহাবস্থান করতে পারেন। কাজেই সমস্ত

লোককে একই সঙ্গে যে কোন একটি ধর্ম বেছে নিতে হবে বা ধর্মহীনতা বেছে নিতেই হবে এ ঠিক নয়—ধর্মনিরপেক্ষতা মানে তা নয়। সেক্যুলা-রিজম শব্দটি শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাই বোঝায় না, সম্প্রদায় নিরপেক্ষতাও বোঝায়। ধার্মিক লোকও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সেক্যুলার হতে পারেন—ইউরোপে বা আমেরিকায় যেমন হয়েছে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদ ছাড়া বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা হবে না, একথা যেমন সত্য তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ হতে না পারলে জাতীয়তাবাদ হবে না, এও তেমনি সত্য। এককালে বাঙালী Vs মুসলমান ছিল অবস্থা, আমরা যেন আবার বাঙালী Vs হিন্দুতে পর্যবসিত না হই। তাতে কোন গৌরব নেই।

বাঙালী হিন্দুরা জনসংখ্যার ১৮%, খৃষ্টানরা ২% ইত্যাদি বিচারে যেন ভেবে না বসি, ধর্মনিরপেক্ষতাও আনুপাতিক ভাবে হবে। ব্যক্তি জীবনে হয় আমরা পুরোপুরিই ধর্মনিরপেক্ষ হই অথবা হই না। এর কোন আনুপাতিক হিসাব হয় না। সরকারের ক্ষেত্রেও তাই। আংশিক ধর্ম-নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই।

তবে একটি দেশের জনসমষ্টির সকলেই এক সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। এটা যেকোন ধর্মনিরপেক্ষ দেশ সম্বন্ধেই সত্য। জনসমষ্টির একটা বৃহৎ অংশ সাম্প্রদায়িক থেকে যেতে পারে। ভারতে যেমনটি হয়েছে। সমাজে নানা রকম Prejudice এর মত এটাও একটি। তবে আমরা আলোচনা করছি রাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ে, সরকারের কর্মপন্থা নিয়ে। রাষ্ট্রীয় ভাবে, সামাজিক ভাবে আজকে ধর্মনিরপেক্ষতার উপযোগিতা প্রমা-ণিত হলে, কালক্রমে বৃহৎ জনসমষ্টিও আস্তে আস্তে সেক্যুলার হয়ে উঠবেন।

অনেকের ধারণা রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক দল যেহেতু নিষিদ্ধ করা হয়েছে অতএব ধর্ম আর রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহৃত হতে পারবে না। এটা ঠিক নয় ; সাম্প্রদায়িকতা উস্কানোর জন্য রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হয় না। অল্প কয়েকজন ব্যক্তিই সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। কেউ এসে 'ধর্ম বিপন্ন' বললেই, আমরা কানের দিকে না তাকিয়ে চিলের পেছনে দৌড়ুতে পারি। এটাই চারিদিকে অহরহ দেখতে পাচ্ছি।

অধ্যাপক রাজ্জাক বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের অভাব আছে, এটা ঠিক নয়। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দীর্ঘ ধারাবাহিকতার উল্লেখ অনেকে করেছেন। আমি তার কথা বলছি না। তবে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একটা নমুনা ছিল, এটাও মনে করিয়ে দেয়া দরকার। আমরা দুইশত বৎসর অন্ততঃ সেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বাস করেছিলাম। তাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—আমাদের কারো ধর্মই বিপন্ন হয়নি। মওলানা আবুল কালাম আজাদের মত দুর্ধর্ষ আলেম সে রাষ্ট্রেই বড় হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর নিজের রাজনৈতিক জীবনে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকেই বহন করে নিয়ে গেছেন। এত বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম পাকিস্তানে আসতে প্রলুব্ধ হননি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তাঁর জানাজাও হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মন্ত্রী ছিলেন বলে তাঁর বেহেশত হাসেল হবে না, বলাটা কি ঠিক ? তুর্কীর মুসলমানদের তবে কি হবে ? কাজেই জনৈক তরুণবন্ধু যখন 'ধর্মনিরপেক্ষ স্বর্গের' কথা তুলেছেন, তা রাগ করেই বলে থাকবেন। কারণ মুসলমান ছাড়া আর কারো বেহেশত, নসীব হবে না, তাই কি ইসলামে বলে ?

তবে লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলেই লোক ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। বৃটিশ শাসনে আমরা যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলাম, তার পেছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ যেমন ছিল তেমনি

ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিভেদনীতি। জনৈক ছাত্রবন্ধু এর বিভিন্ন উদাহরণ আজ দিয়েছেন। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতার সাফল্যের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডল দরকার। চাই সচেতন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা এবং চাই ব্যক্তিগত অনুশীলন।

এজন্যেই আমি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানায় ধর্ম শিক্ষার পক্ষপাতি। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে সম্প্রদায়গুলির ওপর শুধু নির্ভর করে উদাসীন থাকতে পারে না-- তাহলে এক সম্প্রদায় দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের ওপরে encroachment হতে পারে। রাষ্ট্রেরই উচিত সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে যাতে তুলনামূলক জ্ঞান লাভ হয় এবং সহিষ্ণুতা ও উদার মনোভাবের জন্ম হয়, শিক্ষা ব্যবস্থায় তার সুযোগ সৃষ্টি করা। জনকল্যাণের খাতিরেই রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। যাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষা রেখে দেয়ার কথা বলেছেন, তাঁরাও স্বীকার করেছেন মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। মাদ্রাসাতেই আজকে মনের মুক্তি সবচেয়ে বেশী দরকার।

ধর্মনিরপেক্ষতারও অনুশীলনের প্রয়োজন। তা স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বয়ম্ভু নয়। আমাদের জীবনে চর্চা না করলে তা আপনা আপনি চলে আসবে না। ধর্মনিরপেক্ষতার দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের নয়। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছে এবং আমরাও রাষ্ট্রের প্রতি তথা রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছি, অতএব আমাদের আর কিছু করার নেই বা ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে এই ধরনের আলোচনা নিরর্থক এটা ঠিক নয়। রাষ্ট্রের অন্য আর তিনটি মূলনীতির মত এটিও একটি আদর্শ। অন্য আদর্শগুলির মত এ আদর্শকেও আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে সত্য করে তুলতে হবে।

উ প সং হা র :

বিশেষ প্রবন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অন্যান্য অনুষঙ্গ

প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ,
উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বি শ্ব বি দ্যা ল য়, ধ র্ম নি র পে ক্ষ তা ও অ ন্যা ন্য অ নু ষ ঙ্গ

প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ
উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে আজ আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সম্পর্কে যে এতটা ভাবিত তা একেবারে অহেতুক বা আকস্মিক নয়। উনিশ শো সাতচল্লিশ সনে ধর্মকেই এদেশের মানুষ তাদের নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গত পঁচিশ বছর ধরে যেই ভিত্তিতে আস্থা ক্রমশ উৎসাদিত হতে হতে উনিশশো একাত্তরে তার অবলুপ্তি ঘটল। ভিন্নতর মৌলনীতির ওপর আজ রাষ্ট্রীয় আদর্শ সংস্থিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা সেই আদর্শের অন্যতম দিক। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মনির্ভরতা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতায় উত্তরণের ইতিহাস। অবশ্য রাষ্ট্রীয় জীবনে এক সময়ে ধর্মে অঙ্গীকার ও পরে তাকে অস্বীকার এ দুয়ের পেছনেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান। তবে লক্ষণীয় এই যে, পঁচিশ বছর আগে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকে যখন এদেশের মানুষ সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল, তখন কোন ধর্মীয় উৎকর্ষ সাধন তাদের লক্ষ্য ছিল না বা ধর্মরাজ্য স্থাপনের কোন নৈতিকবোধ তাদের উজ্জীবিত করেনি ; তাদের লক্ষ্য ছিল, যুগ যুগ ধরে যে শোষণ ও বঞ্চনা চলে আসছিল তার হাত থেকে অব্যাহতি। কিন্তু গত পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় তারা জেনেছে শোষণ ও বঞ্চনা সম্প্রদায়গত পরিচয় থেকেই উৎসারিত নয় এবং ধর্মগত পরিচয়ের ঐক্য শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিষেধকও নয়। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিটাই ভ্রান্ত ছিল। আঞ্চলিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাই সম্প্রদায়গত পরিচয়কে পাশ কাটিয়ে নতুন ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপকতর

ভিত্তিতে শক্তি খুঁজেছে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী অন্বেষার পরিসমাপ্তি ঘটল ; সম্প্রদায়গত পরিচয়ের ভ্রান্তি নতুন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার সত্যতর প্রত্যয়ে উত্তরিত হল।

ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনায় বাংলাদেশের এই পটভূমি মনে রাখা প্রয়োজন। আমাদের আজকের এই ভাবনা যেমন স্বয়ম্ভু নয়, তা যে নিরাসক্ত এ্যাকাডেমিক হবে তাও আশা করা অনুচিত। অভিজ্ঞতার অভিঘাতে আমাদের সব ধারণাই নিরন্তর সৃজিত ও আলোড়িত হচ্ছে। আমাদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ ও অর্থ তাই আমাদের অভিজ্ঞতায় ও অন্বেষায় বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে। তাকে সেই ভাবে তুলে ধরাই সংগত মনে করি।

আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা এসেছে একটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে। কোন সেক্যুলর দর্শন-প্রস্থান বা ধর্মীয় নীতিবোধ দ্বারা এই উত্তরণ অনুপ্রাণিত হয়নি। বরং অতীত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও বর্তমান প্রয়োজন আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে। এটা আদৌ আকস্মিক নয় যে, বর্তমান রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রেও আস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়েছে। পূর্বতন পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অপমৃত্যুর সঙ্গে ধর্ম কেন্দ্রিক রাজনীতির একটা যোগসূত্র ছিল। বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক শোষণ ও প্রতারণা ঢাকা দেয়ার জন্য বার বার ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ ও সংহতির দোহাই পাড়া হয়েছে। ফলে কার্যক্ষেত্রে ধর্মীয় শ্লোগান বাংলা দেশে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করার চাইতে কেন্দ্রীয় শাসক ও শোষকদের প্রতারণার সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। একই ভাবে ধর্মীয় জিগিরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ভারত

বিরোধী নীতি। যেহেতু ১৯৪৭-এর ভারত বিভাজন ছিল ধর্মভিত্তিক তাই প্রতিবেশী ভারতবর্ষকে মূলত হিন্দু ভারত বলে সন্দেহ, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের উৎস হিসেবে চিত্রিত করতে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু এর ফল আভ্যন্তরীণ রাজনীতির পক্ষে হয়েছে মারাত্মক। ভারতবিরোধী সমর প্রস্তুতির নামে পাকিস্তানী সামরিক চক্র ক্রমেই দেশের রাজনীতিতে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ভারতের ক্ষতি হয়েছিল হয়ত অনেক—কিন্তু পাকিস্তানে রাজনৈতিক চিন্তার বিকৃতির ফলে সামরিক চক্রের হাতে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটেছে, তথাকথিত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদও সত্য হয়ে ওঠেনি। অথচ বাঙালী মুসলমানের ধর্মবোধের ত কোন কমতি ছিল না? বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ভাষাভিত্তিক ঐক্যবোধের সহজ সত্যটি পুনরুচ্চারিত হয়েছে মাত্র। রাষ্ট্রীয়নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র বাঙালী অভিজ্ঞতায় একই প্রতিক্রিয়ার এপিঠ ওপিঠ যেন; অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার যেমন সূচিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য নির্দেশে।

কিন্তু আজকের সেক্যুলর প্রবণতার একটি দার্শনিক পটভূমি আছে। সেক্যুলারিজম শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতা বা সহিষ্ণুতাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না। একটি ধর্মাতিরিক্ত ঐহিক মনোভঙ্গী এর সহোদর। আজকের জগতের জটিল কর্মকাণ্ডের নানা জাগতিক আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠায় একটি ধর্মেতর মনোভঙ্গী অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনের ভূমিকা সেখানে গৌণ হয়ে এসেছে, সবসময় বিরোধী না হলেও। পার্থিব নানা আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম সহায়ক হিসেবে আসতে পারে না তা নয় বরং অতীতে পাকিস্তান আন্দোলনে এই ভূখণ্ডের মুসলমানরা ধর্মকে অবলম্বন করেছিলেন পার্থিব উন্নতির আশাতেই। কিন্তু বাস্তবে ধর্ম সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নতির সহায়ক খুব কম সময়েই হয়। ঈশ্বরনির্ভর অদৃষ্টবাদ বা অলৌকিক স্বর্গের প্রতিশ্রুতি অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য

জাগতিক কর্মোদ্যোগকে নির্বাপিতই করে, এবং ধর্মীয় অনুশাসনাবলীর প্রতি আনুগত্য সামাজিক স্থিতাবস্থার স্বপক্ষেই মনোভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যদিকে ধর্মাতিরেক সেক্যুলর প্রবণতা কোন রকম স্থিতাবস্থা বা প্রাপ্ত অনুশাসনকেই প্রশ্নের উর্ধ্বে বলে মানতে রাজী নয়। কোন পরমার্থের সান্ত্বনা বা অপার্থিব উদ্দেশ্যবোধের চাইতে পার্থিব সাধারণ্যের কল্যাণ তার অভিষ্ট—এই পার্থিব কল্যাণবোধ আত্যন্তিকভাবে ধর্মবিরোধী নয়, তা ধর্মনিরপেক্ষ। সেক্যুলর মানুষের মতে অনুশাসন কেন্দ্রিক চিন্তাই স্বাধীন চিন্তার বিরোধী না হয়ে পারে না। অথচ ইতিহাসে জাগতিক অর্থে প্রগতি কি অনুশাসনকে পাশ কাটিয়ে নতুন চিন্তা ও প্রয়োগের পথেই আসেনি? অথচ যদি স্বাধীন চিন্তার পরিবেশে প্রশ্ন করার, বিচার করার বা পরীক্ষা নিরীক্ষার উপযোগী বাতাবরণ না থাকে তবে জাগতিক কল্যাণ ব্যাহতই হতে থাকে, প্রগতি হয় অনায়ত্ত। পূর্বতন পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও ধর্ম এতদঞ্চলের জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণের চাইতে প্রত্যাশা ভোলা-নোতেই অনেক বেশী সচেষ্ট থেকেছে, অনুশাসনের প্রতি আস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মুক্তিতে এদেশের লোককে উপনীত করতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় জীবনে তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মমাত্রিক চিন্তা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে।

সেক্যুলারিজম তাই স্বাধীন চিন্তারও পূর্বশর্ত, আমাদের অভিজ্ঞতা একথাকে আজ অনেক বেশী সমর্থন জোগায়। আধুনিক সমাজের জটিল জাগতিক সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানে সনাতন বিধিনিষেধের নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন আজকের মত এত প্রকট হয়ে কখনো দেখা দেয়নি। কিন্তু এই স্বাধীন চিন্তা হঠাৎ চাইলেই শুরু করা যায় না। তারও উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই, শিক্ষায় তার প্রকাশের সুযোগ চাই, বাস্তবে তার প্রয়োগের সঠিক পরিবেশ চাই।

সমাজে মানুষের দীর্ঘদিনের আচরণে ও অভীপ্সায় স্বাধীন চিন্তার ঐতিহ্য গড়ে না উঠলে সেই ঐতিহ্য গড়ে তোলার প্রয়াস চাই। এই

প্রয়াসের প্রয়োজন সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যতটা তার চেয়ে অনেক বেশী বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। কারণ একদিকে শুদ্ধ জ্ঞানের রাজ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিরন্তর সত্যের অন্বেষণ যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সিদ্ধান্ত যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের অনেকেরই শিক্ষা ও মনোগঠনের প্রধান বাস্তব ক্ষেত্রও এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। আজকের পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণ শুধু মাত্র বুদ্ধি বিবর্জিত শুভেচ্ছার স্বেচ্ছাচারে বা ঋষির অলৌকিক অঘটনে সম্ভবপর নয়। অথচ এই সামূহিক কল্যাণই বর্তমানে আমাদের সব চেয়ে জরুরী। সত্যে আগ্রহ, চিন্তায় সাবালকত্ব ও কর্মে মানবমুখীনতা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রকাশ না পেলে ঐ কল্যাণ কেবল দূরের বস্তুই রয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সমাজকে প্রথাবদ্ধ চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে নতুন করে ভাবতে, কল্পনা করতে, দুঃসাহসিক কর্মোদ্যোগে অংশ গ্রহণ করতে উদ্দীপিত করা, সামাজিক মুক্তিকে প্রথমে মানসমুক্তির মধ্য দিয়ে সূচিত করা।

তবে স্বাধীন চিন্তা ও চিন্তার স্বাধীনতা ধারণা হিসেবে কাছাকাছি হলেও ঠিক সমার্থক নয়। যে কোন বিষয়ে জাগতিক ও অতিজাগতিক সব বাধা বা নিরোধ (taboo) অস্বীকার করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যত দূর সম্ভব পূর্ণভাবে ভাববার বা কল্পনা করার ক্ষমতা বা প্রবণতা চিন্তার স্বাধীনতা থাকলেই সম্ভবপর। যা খুশী ভাববার অধিকার হল স্বাধীন চিন্তা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে বাস্তব কল্যাণবোধ বা প্রয়োগ চিন্তার কোন যোগ নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাই স্বাধীন চিন্তা, চিন্তার স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। যেমন কোন সমাজ যদি স্বেচ্ছায় অদৃষ্টবাদ মেনে নিয়ে তাতেই আত্মতুষ্ট হয়ে থাকতে চায় তবে তাতে দায়িত্বহীন স্বাধীন কল্পনা ক্ষুণ্ণ না হলেও চিন্তার স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অথচ সমাজে ব্যক্তিকে চিন্তায় সক্ষম করে তুলতে হলে চিন্তার স্বাধীনতা

চাই এবং তার জন্য স্বাধীন চিন্তা বা কল্পনার সাহসিকতা ও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত মানসিকতা শ্রদ্ধেয় হলে চিন্তার স্বাধীনতা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সাহসী কল্পনার উদ্বোধন অন্যথায় মননের ক্ষমতাই নিরোধ কণ্টকিত সমাজে আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। আমাদের সমাজে যেমন হয়েছে।

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে নানা মহৎ ভাবনা সেই সেই কালের জনগণের জীবনে অথবা তাদের চিন্তায় বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু একদা মহৎ ও উপযোগী সেই সব ভাবনা যখন তার সৃজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে জনগণের ঘাড়ের ওপর 'কর্তার ভূতে'র মত জোর করে চেপে থাকে তখন তা হয়ে পড়ে অমঙ্গলের বাহন এবং তা জীবন বিরোধী। এটা কোন ধারণা সম্বন্ধে যেমন সত্য তেমনি সত্য কোন ঐতিহাসিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে। যথা এই উপমহাদেশে এককালের শ্রম বিভাজন পরবর্তীকালে বর্ণ বিভাজনে রূপ নেয়। জাতিভেদ প্রথা পরিণতিতে শোষণের নামান্তর হয়ে সামাজিক অমঙ্গলের কারণ হয়, সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ করে। মধ্যযুগীয় ইউরোপে যেমন চার্চের অনুজ্ঞায় জীবনের চাইতে মৃত্যু ও মৃত্যু-উত্তর অস্তিত্ব মহত্তর বলে পূজিত হতে থাকে। যদিও মানুষের সহজাত জীবন তৃষ্ণা ঐ মৃত্যু পূজাকেই আশ্রয় করে উল্লসিত উৎসবে বিকিরিত হয় মহররমের মত। কিন্তু তবু বলা যায়, চার্চের দৌরাত্ম্য জীবনী শক্তির স্ফুরণে বাধা দেয়, সবটুকু সফলকাম না হলেও। কোন ধারণা তাই কালের সঙ্গে সঙ্গতি হারালে তাকে ধরে রাখার চেষ্টা জীবনের উদ্দেশ্যকেই পরাস্ত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম আদর্শ যদি হয় জীবনের উৎকর্ষ বিধান, তবে এ ধরনের স্থবিরত্ব থেকে মুক্তি খোঁজা তার একটা সামাজিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তার ইতিহাসে যেহেতু চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই, জ্ঞানের নিরন্তর নবায়ন যেহেতু সভ্যতাকে অগ্রগামী করে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ জীবনকেই পোষণ

করে। সেক্যুলারিজম তাই জীবনের তাগিদ দ্বারাই উচ্চকিত--চিন্তার স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতা এই ধারণা বা বিশ্বাস থেকে নয়। যে জ্ঞান বা ধারণা নতুন জ্ঞানের আলোকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে তাকে বয়ে বেড়ানো পণ্ডশ্রম। জীবনেরই প্রয়োজনে জীবন থেকে তাকে নির্বাসন দেবার অধিকার ও সাহস বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে একথাও ভোলা অনুচিত যে, এই সব প্রয়াসের চরম লক্ষ্য গণমানুষের কল্যাণ। মুক্ত বুদ্ধির চর্চা একটা উপায় মাত্র। এই উপায়ই পরিণতিতে যেন লক্ষ্য হয়ে না দাঁড়ায়।

মুক্তবুদ্ধির চর্চাও যদি আদর্শ হিসেবে ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তাও মানুষের কাছে এক ধরণের জুলুম হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু বন্ধন বা ভ্রান্তি মানুষ জীবনের প্রয়োজনে মেনে নেয়। তাকে অবিদ্যার আবাহন বলে ধিক্কার দেয়া ঠিক নয়। জ্ঞানের নিরবয়ব শুদ্ধতা যদি পণ্ডিতকে মানুষের সহজ জীবন ধারার সত্য থেকে দূরে ঠেলে তবে তা ব্যক্তিকে যতই শুদ্ধ সুন্দর করুক না কেন সামগ্রিকভাবে মানবজীবনকে তা এতটুকু উজ্জীবিত করে না।

এই সব তত্ত্ব অবশ্য শুধু মাত্র হাওয়ার ওপর দাঁড় করানো যায় না। কোন বিশেষ সময়ের বাস্তব পরিবেশ তৎকালীন মানুষের চিন্তা ও আচরণ বিধিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে ; বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে একেবারে বাদ পড়ে না। ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম গড়ে ওঠে প্রধানত ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য। যে যুগের মানুষের কাছে ঐ শিক্ষার বিশেষ মর্যাদা ছিল, তার জন্য সামাজিক তাগিদ ছিল। শিক্ষার ভারও ছিল এমন সব পণ্ডিত ব্যক্তির ওপর, যাঁরা ছিলেন জাগতিক বিষয়সমূহে নির্লিপ্ত, সংসার বন্ধনহীন চিরকুমার ও সতত আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন। তাঁদের এই বিষয়বিমুখ, নির্লিপ্ততার আদর্শ যেহেতু সাধারণভাবে শ্রদ্ধেয়

ছিল তাই সামাজিক বিষয়ী মানুষের আচরণ, তার ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাদের সমালোচনা জনগণ মেনে নিয়েছে, যদিও এই সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের আপোসহীন দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। এ সমালোচনা অনেকাংশেই হয়তো বা কঠোর এবং সবসময় বাস্তববোধেরও পরিচয় দেয়নি। কিন্তু আমাদের আজকের ক্রমপ্রসরমান বিদ্বৎ সমাজ সম্বন্ধে একথা বলা যায় কি ? বিদ্বৎ সমাজ সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে সে অর্থে বিছিন্ন, সুদূর দূরত্বেও অবস্থিত নন এবং তাঁদের সামাজিক ভূমিকায়ও পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক পরিবেশ তাঁদের সমাজ সমালোচনার সুযোগ দেয় সত্য কিন্তু সেই সমালোচনা আগের মত আর নিরাসক্ত থাকে না। আপন আপন স্বার্থ ও ইচ্ছার সংকর্ষণে তার প্রভাবিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং হয়। বিদ্বৎ সমাজের সমালোচনার কার্যকারিতা এর ফলে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। আমি প্রাক-এলিজাবিথীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় পণ্ডিতবর্গের নিরাসক্ত কৌমার্যের চিত্রটিকে গৌরব মণ্ডিত করে দেখাবার চেষ্টা করছি না, ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকার জন্য এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চিন্তাগত পরিবেশে উদারনীতির স্থান ছিল না এবং ধর্ম নির্ধারিত মূল সত্যগুলি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু প্রায় এই সময় থেকেই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির প্রসার, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও শেষ পর্যন্ত শিল্প বিপ্লব ইউরোপের চিন্তার বাস্তব পটভূমিটাকেই বদলে দেয়। সামাজিক কাঠামোর রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে উদারনীতির আদর্শ সমাজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃতি পায়। প্রাগ্রসর সমাজের জীবনতৃষ্ণা সমাজের সর্বশ্রেণীর লোককে স্পর্শ করে, বুদ্ধিজীবীরাও তাঁদের নিরাসক্ত বৈরাগ্যের চাইতে জীবন সম্ভোগের জটিলতায় সত্যসন্ধানে নিন্দনীয় কিছু দেখতে পান না। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত ধারণাসমূহ সম্পর্কে সংশয় তাঁদের নতুন অম্বিষ্টে উদ্দীপিত করে। প্রাপ্ত জ্ঞানের নিশ্চিন্ততা নয়, অজানার সত্যের অনিশ্চয়তা জিজ্ঞাসু মনকে অনেক বেশী আকর্ষণ করে। অবশ্য সপ্তদশ শতকের পর থেকে

বিজ্ঞানের নবনব দিগন্ত উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানের রাজ্যেও মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করা ও প্রয়োজন হলে প্রতিবাদ করার প্রেরণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিবেশে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। ধর্মতত্ত্ব প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নবীন ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের চর্চায় প্রাণবন্ত হয়।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কল্যাণমুখী, প্রয়োগধর্মী স্বাধীন চিন্তায় চঞ্চল হোক এটা আমরা চাই। কিন্তু চিন্তা সত্যিই স্বাধীন হতে হবে। বিদ্বৎ সমাজকে স্বাধীন চিন্তার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। দেশের মানুষ ব্যক্তি জীবনে প্রথাবদ্ধ ধর্মের প্রয়োজনীয়তায় আস্থাবান। সমাজ জীবনেও এই আস্থার ভূমিকা আছে। যে নতুন জ্ঞান ও চিন্তা প্রাগ্রসর দেশগুলির বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের সমাজের সাধারণ শিক্ষিত লোকের দূরত্বের কথা ভুলে যাওয়াটা মুর্খতা হবে। সনাতন আজন্ম লালিত বিশ্বাসের ভূমি থেকে সরে অনিশ্চিত নতুনকে আবাহন করার আদর্শ শ্রদ্ধেয় ও কাম্য হলেও সহজ নয়। বিদ্বৎ সমাজের মুক্তি চাই এক্ষেত্রে প্রথম। অন্যদিকে সমাজচিন্তার নিরাসক্ত সত্যসন্ধ কল্যাণমুখী দৃষ্টি গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ক্ষুদ্রগণ্ডী থেকেও তাঁদের মুক্ত হতে হবে। এই দুই প্রান্তেই বিচ্যুতি সম্ভব। দুঃসাধ্য লক্ষ্যে ইচ্ছামাত্র উপনীত হওয়ার অসহিষ্ণুতা এই বিচ্যুতি ডেকে আনে এবং এই জাতীয় বিচ্যুতি শেষ পর্যন্ত স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী। অসহিষ্ণুতার সঙ্গে সেক্যুলারিজমের কোন সহমর্মিতা নেই।

অস্বীকার করা যায় না, আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সামাজিক ভাবে গুরুত্বপুর্ণ। দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী নয় এবং উচ্চশিক্ষিতের অধিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেই সবচেয়ে বেশী। দেশে তাঁদের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট সচেতেন এবং তাঁদের হাতে

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্ষমতা আছে। ভয়টা হল এইখানে যে, ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীস্বার্থে সমাজের ওপর চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁদের আছে ; এই ক্ষমতার অপব্যবহারও অনেকসময় ঘটে থাকে। এ ছাড়া আরেকটা দিক আছে, কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ; বিশ্ববিদ্যালয়সমাজ যাঁদের নিয়ে গঠিত তাঁদের সামাজিক পটভূমিতে জীবনের অনেকখানি অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা আচ্ছন্ন। এই বিশ্বাস থেকে মুক্তি তাঁদের অনেকের পক্ষেই অনায়ত্ত থেকে যায়। কাজেই প্রতিবেশের এই সমস্ত জটিলতা ও সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ মুক্ত চিন্তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভাবতে হবে ও অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাইরে থেকে মুক্ত চিন্তা হোক চাইলেই চিন্তার মুক্তি ঘটে না। তাকে ভেতর থেকে গড়ে উঠতে হবে। অন্যথায় আমাদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষুন্ন হবে এবং লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ও বর্তমানের সঙ্গে আত্মিক সংযোগহীন সমাজ আপন ভ্রান্তির আবর্তে পাক খেতে থাকবে। এতে না আসবে কল্যাণ, না দেখা দেবে প্রগতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার প্রসার ঘটাতে হলে বাস্তবে সমাজের বিভিন্ন কর্মে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় আজকের যুগে কোন বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। সমাজ তাকে পোষণ করে, প্রভাবিতও করে। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকে নেতৃত্ব দেবে ঠিকই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যদি এমন কিছু করে যা সমাজের চোখে অনাচার, তবে সমাজ তাকে সহজ স্বীকৃতি দেবে না। অন্যদিকে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন অনেকাংশে তার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যে দেশের মানুষ অতি দরিদ্র অথচ ধনী হবার সাধ যেখানে পুরোমাত্রায় বর্তমান, সেখানে উদার দৃষ্টিভঙ্গী সহজে গড়ে ওঠা মুশকিল। অতীত শোষণের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ বঞ্চনার আশংকা সেখানকার জনগণকে অসহিষ্ণু করে তোলে। পাছে কিছু খোয়া যায় এই ভয় তাদের সারাক্ষণ

পীড়িত করে। বাইরের কোন নতুন ধারণা তাদের কাছে সন্দেহের বস্তু হয়ে দেখা দেয়। নিজেদের অস্তিত্বের ক্ষুদ্র সীমাটুকু প্রতিরক্ষায় তাদের সমস্ত আবেগ অপচয়িত হয়, সীমাটুকু ভেঙে ফেলে অন্যের ধারণা বা অস্তিত্বের সঙ্গে সেটাকে প্রসারিত করে নেয়ার মত উদারতা বা স্থৈর্য তাদের পক্ষে সহজ হয় না। এ অবস্থায় সত্যিকার অর্থে সেক্যুলারিজম সমাজে আপনা থেকে গড়ে উঠবে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত মনের চর্চা সমাজ বিনা সংশয়ে, বিনা উৎকণ্ঠায় সাগ্রহে আবাহন করে নেবে এতটা আশা করা যায় না। তবে সাধারণভাবে এটুকু আশা প্রকাশ বোধ হয় করা যায় যে, অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হলে এ সমাজে মানুষের স্নায়ুর ওপর চাপ হয়ত অনেকটা কমবে। মুক্ত চিন্তার পরিবেশ গড়ে তোলা সে অবস্থায় অনেক সহজ হবে। লোম্বার্ডির বণিককুলের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লিবার‍্যালিজমের উত্থান এর একটা প্রাথমিক উদাহরণ হিসেবে নেয়া যেতে পারে।

ধর্মনিরপেক্ষতার সবটুকু অবশ্য ব্যক্তির একক দায়িত্ব নয়। সমাজের দিক থেকেও এ প্রসঙ্গে কিছু ভাববার অবকাশ আছে। রাষ্ট্র যখন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে তখন তার অর্থ মোটামুটি এই দাড়ায় যে, তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে রাষ্ট্র ধর্মকে কোন নীতি বা উপাদান হিসেবে ব্যবহার করবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার এর অন্যতম শর্ত। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র আগের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। কাজেই রাষ্ট্র যদি নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে স্বীকার করে তবে সমাজে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ অনেক কমে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত বুদ্ধির চর্চার কথা যখন বলা হয়—তাও করা হয় সমাজের সার্বিক কল্যাণের কথা মনে রেখেই। এতে ব্যক্তিরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে। তবে সমাজে মানুষের অগ্রগতি কতটা ত্বরান্বিত হল বা ব্যাহত হল, তাই হবে এ জাতীয় কর্মোদ্যোগের উপযোগিতার মাপকাঠি।

রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা অবশ্য ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসকে স্পর্শ করে না। সে তার আপন বিশ্বাস নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে, রাষ্ট্রের তা নিয়ে সত্যি মাথা ব্যথা নেই। অন্যদিকে শিক্ষায়তনে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটলেই ব্যক্তির ভাবজগৎ থেকে ঈশ্বর পুরোপুরি নির্বাসিত হয়ে পড়বে, এও ঠিক নয়। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণায় চরম পারদর্শিতা দেখিয়েও কারো পক্ষে ঈশ্বর বিশ্বাস অটুট রাখা সম্ভব। সেক্যুলারিজম একটি উদার ও ব্যাপক চিন্তাধারণক্ষম মনোভঙ্গী (braod spectrum) যা জীবনে দুর্জ্ঞেয়তার সম্ভাবনাকে স্বতঃই অস্বীকার করে না। কিন্তু সেক্যুলারিজমের প্রাথমিক অর্থ যদি ধরি ধর্মনিরপেক্ষতা (যা মোটেই সন্তোষজনক নয়) তবে ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হয় ঈশ্বর নির্ভর জগতের সবরকম অনুষঙ্গ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। সহজকে অস্বীকার করে এ হলো স্বেচ্ছায় ও সচেতন ভাবে কঠিনকে বরণ করা। কারণ তদবস্থায় ঈশ্বরহীন জগতে রূপ, রস, আনন্দ ও নীতিবোধ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হয় তার নিজেকেই। তার ভার কম নয়। ঈশ্বর যেখানে নেই ব্যক্তি সেখানে তার ধারণার জগৎ গড়ে তোলে বিজ্ঞানের সত্য থেকে, শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ভাবরূপ থেকে ; অনুভবে বিস্ময় ও আনন্দের উৎস অন্বেষণ থেকে। আইনস্টাইনের বিশ্বচেতনা সেক্যুলার মানুষের মনে ব্যাপ্তির বোধকে জাগরূক রাখে, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, মোৎসার্ট বা বিটোফেন তার জীবন চেতনাকে সুতীক্ষ্ণ করে, আপন ব্যক্তি জীবনের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের নিঃসঙ্গতাকে যেমন সে অতিক্রম করে ইতিহাসের প্রবহমানতায় মানুষের বিড়ম্বিত আনন্দ বেদনা ক্লিষ্ট ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে। সেক্যুলার মানসিকতা আত্যন্তিক ভাবে সবসময় এই ছকেই নিজেকে সাজায় এমন নয় ; কিন্তু এসবই তাকে করতে হয় একক প্রয়াসে অস্তিত্বের শূন্যতাকে পূর্ণ করার সাধনায়। কোন নির্দিষ্ট পন্থা তার জন্য তৈরী থাকে না।

সেক্যুলার মানুষের নৈতিক মতাদর্শ তার ঐ নিঃসঙ্গ অভিযানের পথেই গড়ে ওঠে। যা কিছু সে করে তার দায় পুরোপুরি তার নিজের।

মানব কল্যাণের ধারণাটাও তার আপন অন্তরের আলোকে গড়ে নিতে হয়। আরোপিত আদর্শে সেক্যুলার মানুষ বিশ্বাসী হতে পারে না, কারণ তা মূলতঃ সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গীরই বিরোধী। অবশ্য ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণা নির্বাপিত হলেও সামগ্রিক জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বজগতের পশ্চাতে কোন মূলীভূত শক্তির সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সেক্যুলার মানুষের কাছেও সেই সম্ভাবনা এক উন্নততর নৈতিক মতাদর্শের ভিত্তি রচনা করতে পারে। আসলে উন্নততর নীতিবোধের রচনার জন্যই সেক্যুলারিজমের প্রয়োজন। নীতিবোধ বর্জন করা তার লক্ষ্য নয়।

কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক নীতিবোধের প্রধান ভিত্তি যেখানে ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালভীরুতা সেখানে সেক্যুলার মানুষের একক অভিযানে সহমর্মী সঙ্গী মেলে খুব কমই। প্রথাবদ্ধ সমাজের মানুষের সঙ্গে সামাজিক ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অনিবার্য প্রয়োজন সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে সেক্যুলার মানুষকে আপোস করতে বাধ্য করে। তার অকলঙ্ক ঋজুতা হয়ত তাতে ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু জীবন তো সে অর্থে কেবল ঋজুতা নয়।

তবু সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার প্রয়োজন রয়েছে। উন্নততর নীতিবোধ ও সমৃদ্ধতর সমাজ গড়ে তোলা এর লক্ষ্য তবে মনে রাখা প্রয়োজন সেক্যুলারিজমের তাত্ত্বিক ধারণাও একদিনে স্পষ্ট হয়নি, তাও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফসল। সামাজিক প্রথাবাহিত অনুশাসনের নিগড় থেকে ব্যক্তির চিন্তা ও আচারের মুক্তির প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রতিবেশেরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এসেছে—কিন্তু সর্বতোভাবে এ আকাঙ্ক্ষা এসেছে চিন্তায় যুক্তি প্রয়োগের অনুগামী হয়ে। সেক্যুলারিজম আর মুক্ত বুদ্ধি প্রায় সমার্থক ধারণা হিসেবে দেখা দিয়েছে। শিক্ষা চিন্তায় এই বুদ্ধি কর্ষণার ওপর জোর দেয়া হয়ে এসেছে। রেনেসাঁর থেকে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার

পেছনে এই বুদ্ধি প্রয়োগের প্রেরণা। তার অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞানে এই মুক্ত বুদ্ধির প্রসার। এর ফলাফল যে সর্বতোভাবে কল্যাণময় হয়েছে, আজকের বিজ্ঞানভিত্তিক সমরসজ্জার দিকে তাকিয়ে এমনটি বলা যাবে না। এমন কি বুদ্ধিকে যে সর্বত্র মুক্ত রাখা গেছে তাও নয়। কি সমাজ জীবনে কি ব্যক্তির জীবনে আমাদের সমস্ত ব্যবহার কেবল মাত্র যুক্তি দ্বারা শাসিত হয়নি। কিন্তু তবু যুক্তি বা বুদ্ধি ছাড়া সামাজিক ব্যবহারের অন্য কোন নৈর্ব্যক্তিক সর্বজনীন সূত্রও অনন্যনির্ভরভাবে আমাদের কাছে নেই। এসবই তার অসন্তোষজনক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আধুনিক সভ্যতার ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে সাম্প্রতিক কালে বহু পাশ্চাত্য চিন্তানায়ক দ্রষ্টার বুদ্ধিবিরোধী প্রতিক্রিয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিরাবেগ যুক্তি অনুসরণের আদর্শ সম্বন্ধে নতুন করে ভাবিত করে। কাজেই সেক্যুলারিজমের তাত্ত্বিক ধারণায় যে মুক্ত বুদ্ধির আদর্শ অনিবার্য হয়ে ছিল তার পরিসর বিস্তৃততর করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং শুধু মাত্র বুদ্ধির কর্ষণা থেকে প্রসারিত হয়ে মানুষের আবেগ, ইচ্ছা ও কল্পনার জটিলতাকেও আশ্রয় দিতে হবে এ ধারণাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণশক্তির কেন্দ্রে যুক্তির অনুপ্রেরণা ঠিকই কিন্তু তার সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি জীবনের বহুমুখী বিচিত্রতাও এই সভ্যতারই বর্ণিল প্রকাশ। সেক্যুলারিজম নিরঙ্কুশ যুক্তি অনুসৃতির নামে এই বিচিত্রতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেনি বরং মনে হয় সেক্যুলারিজম এই বিচিত্রতাকেই সার্থকতর করে তুলবে। শিক্ষায়তনে সেক্যুলারিজম তাই কেবলমাত্র বুদ্ধিকর্ষণাতেই রূপ পাবে এমন ভাবা ভুল হবে। বাংলার নিসর্গ, তার নদী, তার নারী, তার যা কিছু আমাদের সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, গ্রামীণ পটে ও লোকসংস্কৃতিতে মূর্ত হয়ে আছে – আমাদের এই আশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়জ চেতনা আমাদের সেক্যুলারিজমেও স্থান করে নেবে।

সবশেষে আমি যে বাস্তবিক প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে যেতে চাই। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার একটি

ঐতিহাসিক প্রস্থানভূমি আছে—তা নিরালম্ব নয়। নিরাপোষ যুক্তি অনু-স্মৃতির তাত্ত্বিক প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সেক্যুলারিজমে উপনীত হইনি অন্ততঃ এখনো নয়। একটি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যই বর্তমান রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রেরণা। সেটা হয়ত খুবই সীমিত লক্ষ্য, কিন্তু তার গুরুত্ব আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা পরিচালিত বাঙালী জন-গোষ্ঠীকে একটি সাধারণ, সর্বজনগ্রাহ্য পরিচয়ে উদ্দীপিত করার প্রয়োজন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সমগ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণমূলক কার্যক্রমে সকলের সহজ, নির্বাধ ও আবেগসমৃদ্ধ সমান অংশ গ্রহণের বাস্তব প্রয়োজন এর পেছনে অনুপ্রেরণা। কি রাজনীতি, কি সামাজিক জীবনযাত্রা, কি অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীমাত্রিক চিন্তা থেকে উৎসারিত বিরোধ ও আত্মক্ষয়ী উত্তেজনাকে প্রশ্রয় না দেয়াই এই নীতির লক্ষ্য। ধর্মনিরপেক্ষতা এই লক্ষ্যে নিয়োজিত কার্যক্রমের পর্যায় ভেদ মাত্র। সেক্যুলারিজমের মহত্তর কোন প্রাপ্তি যদি এই মুহূর্তে সুদূর পরাহত মনে হয় তবু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর অন্বেষা সেই আশা-বাদকে জাগরূক রাখবে এটুকুই শিক্ষায়তনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাসঙ্গিকতা।

পরিশিষ্ট

কাজী জোন হোসেন প্রদত্ত মূল ইংরেজী বক্তৃতার অনুলিপি

TRANSCRIPT OF THE SPEECH GIVEN BY MRS QUAZI JOAN HUSSAIN

SECULARISM

Quazi Joan Hossain
Department of English

I hope you will bear with me if I speak in English, as my Bengali is not sophisticated enough to speak on these matters in your language.

Mr. Saha began by defining his own position. Perhaps I had better do the same. I would not call myself a free-thinker. I am a member of the minority community and I confess I have an emotional bias in favour of religion - not necessarily my own religion, but religion in general. And I think although religion may have been exploited to bring out the worst in man from time to time, the higher religions,—by the higher religions I mean those religions whose ethical content is of a social significance equal to if not greater than the magical,—have been forces of good even though they may not have worked directly in the body politic. For example, I should say the welfare states in Western Europe contain a good deal of the spirit of true Christianity,

although this is often not recognised. Some of the best-known social reformers have been convinced and sincere Christians though they did not reflect always the spirit of "Do unto others as you would they should do unto you", and "Love your reighbour as yourself". I believe religion is a necessity for man.

Now in discussing the question of secularism we are to consider the relation of religion to the State. I think it is generally acceptable that the state exists for the general good life of its members and that this includes the inward movement of a good life or, in other words, religion in its private and institutionalised aspects. What then is to be the relation of the State to religion? Well, there are various alternatives. You can have a theocracy where the laws would be divine commands. I think theocracies usually base their laws upon what they call divine justice and divine laws and they assume that the laws as revealed in the scriptures of their religion are the voice of God sent to man through revelation. We have examples of this in medieval Catholicism. You can say that theocracy is acceptable as long as all the subjects are of the same religion. But this very rarely happens. For example, if you look at medieval Catholic states you will find in most of them minorities of Jews. The tyranny exercised upon these religious minorities, persecutions to

which they were subjected, are amongst the most disgraceful things in the history of Europe. It went on for centuries. In modern times you have examples of such a state of affairs in, say, 19th century Saudi Arabia—which at that time was not the unified state it is to-day, but which exemplified religious fanaticism in an extreme form. Anybody who is interested in the situation in Arabia in the 19th century may read Doughty—an English traveller, who has recorded his experiences. He managed to travel through the country without losing his life, but only just. And we usually find that theocracy tends to inhibit free thought, even free mixing, and to impose a strong censorship. It is said that they may be trying to save their subjects by protecting them from going astray. In reality they may well be catering to their own vested interest. But theocracy pure and simple is rare. Some state may be said to have a strong theocratic element in them. If such a state has a religious minority in it we usually find that there are safeguards for the minority on paper but, since religion is the reason for the birth and existence of such a state, it usually contains a large number of extremist elements who belong to the majority religion and who bring pressure on the governmment, sometimes even to have the state converted into a fully-fledged theocracy. I would give the example of Israel — created as a homeland for the Jews. It

contains a very strong, what is called, Zionist minority who constantly put pressure on the Israeli government to turn the state into a complete theocracy. The Israeli Arabs have rights, I believe, on paper but in fact the situation is different. So in these states those who do not belong to the majority religions, or those who are free-thinkers naturally find themselves in a position of insecurity. It may be that all is well, but then at a given moment suddenly all may not be wel ; and we have had examples of that.

There is another way in which the State may be related to religion. It may discourage the accepted religions by withdrawing support from them ; sometimes by active physical persecutions and by chanelling the devotions usually reserved for religions into the service of the State itself, even using the parapharnalia of religion for the glorification of its own ideology. Outside contact is minimal and censorship is rigid. There are examples of such states in the world to-day.

Then we come to this idea of secularism. Now the term itself is vague and I guess this is one of the reasons for having this meeting. Whereas it does not mean the active exploitation of the majority religion, it does not, I take it, on the other hand, mean — and this is being stated in Bangladesh, the absence of religion or the active

discouragement of religious practices. I take secularism to mean the refusal by the government or the State to identify the State with any religion or patronise any religion as the state religion. So it seems to me that you cannot say for example that Bangladesh is the second largest Islamic state, which is not exactly the same thing as saying that this is a state with the second largest number of Muslims. It cannot claim to uphold any specific religious ideology. It cannot impose a religion on all its subjects through the state machinery— for example, through its educational system or the mass-media. The minority has to accept these limitations as well.

But there are many questions which need answering. Is the State to have no ideology? Can one conceive of a state which has no ideology? If it is to have an ideology on what must it be based, since secularism precludes that its ideology be based on one particular religion? Even the medieval Christian Catholics although they accepted divine law as the basis of government they also recognised what they called natural law. The Greeks recognised natural law. Its origin, we find, is shrouded in antiquity, but it was a kind of feeling for justice and recognition by man's reason of what is generally acceptable. Aristotle said that it was universal and eternal. But I believe, these ideas have been questioned since then. However, the Romans recognised

it. Even Catholic St. Thomas Aquinas accepted this and said that it was the voice of God speaking to man through reason. The Secularists of the Eighteenth Century took it over, stating reason as its basis.

Perhaps 'Natural Law' can be used as a basis for secular states but again it is very vague and it has never been formulated ;—it is more a feeling than a code.

Now there is another problem. Since the subjects of a state have their religion and since they will to a certain degree be identifiable groups—perhaps laws have to be framed to prevent the possibility of religious strife. Because religion is a very explosive subject, it is even more explosive when it is exploited and any state based on the principle of secularism must frame safeguards against possible exploitation. Perhaps one of the steps that can be taken is the formulation of laws to prevent the exploitation of religion. We know, ideally, that what is needed is a change of heart, but this does not always happen and it is here that law sometimes helps.

In this respect religious feeling, religious intolerance and religious strife have something in common with racial feeling and racial strife. Their origin is very similar, the problem is very much the same and possibly the way to

deal with them is also the same. We have found in England that the formulation of laws have helped in easing the possibility of racial tension. For example we cannot stand up and incite others to act against the racial minority without the fear of prosecution.

Thirdly, how is the state going to tackle the problem of religion in education? Is it going to ignore it completely, leaving religious instruction in the hands of the parents? Will the religious denominations be allowed to have their own educational institutions subject to state inspection?

It is true that secularism is the acceptable solution and possibly the only solution to the universal problem of the minority, particularly the religious minority. Personally I think that the best way to deal with it is not so much by ignoring religion as by fostering a spirit of toleration through making other religions known. It is surprising how very little we seem to knw about other religions apart from our own. I think more simple general knowledge and information about other religions can be encouraged This can be done through education. Personally I believe, although I am a Christian, that Christianity is not the only way to salvation. All religions, I think, have a certain common ethical base and in a secular state this theme can

be emphasized. Religion should broaden the mind not narrow it, but it is the contrary unhappily that we so often find—that is it narrows the mind instead of broadening it.

I have tried to discuss above some of the problems relating to secularism. But this is a very vast and interesting subject. Others will, I hope, bring into focus many other aspects of the problem.

অর্থ গ্রহণে গুরুতর বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য কিছু কিছু মুদ্রণ-শুদ্ধি দেওয়া হোল। চল্লিশ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লাইনে 'ক্যাথলিজম' স্থলে ক্যাথলিসিজম এবং ষষ্ঠ লাইনে 'কম পুষ্টি' স্থলে পুষ্টি হবে। সাতষট্টি পৃষ্ঠায়, উনবিংশতিতম লাইনে 'সম্বন্ধেও' স্থলে সমাজেও হবে। ছিয়াত্তর পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে 'আবরণে' স্থলে আচরণে হবে। ছিয়াশি পৃষ্ঠায় 'মান্নান' স্থলে মাবুদ হবে। একশ ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় একাদশ লাইনে 'ভবিষ্যতের পক্কেই' স্থলে ভবিষ্যতের সঙ্গেই হবে। এ ছাড়া denomination, package expediency, conscientious ও broad এই শব্দগুলি ভুল ছাপা হয়েছে। ক্ষুদ্রতর ভুলগুলি পাঠক সহজেই ক্ষমা করবেন।